বাংলার পাখী

রায় সাহেব
শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্—এলাহাবাদ
ও
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৯৩২

[মূল্য ১৷৹ টাকা

পরম-স্নেহাস্পদ

নবদ্বীপাধিপতি মাননীয় মহারাজ

শ্রীমান্ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়

বাহাদুরের

শ্রীকর-কমলে

নিবেদন

এই ছোটো পুস্তকখানিতে বাংলাদেশের সাধারণ পাখীদের পরিচয় দিয়াছি। আমাদের চোখের সম্মুখে সর্ব্বদাই নানা ঘটনা ঘটে। চোখ খুলিয়া সেগুলিকে দেখা এবং দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করা, একটা বড় শিক্ষা। এই শিক্ষার অভাব আমরা পদে পদে অনুভব করি। এই পুস্তকে পাখীদের যে সামান্য পরিচয় দিলাম, তাহা পড়িয়া যদি আমাদের বালক-বালিকাদের কৌতূহল জাগিয়া উঠে, তবেই পুস্তক-রচনা সার্থক হইবে। পস্তকের ভাষা যতদূর সম্ভব সরস ও সরল করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পট এবং ভিতরকার অধিকাংশ চিত্রই স্বনামধন্য চিত্রকলাবিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়েব অঙ্কিত। রঙিন্ ছবিখানি বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত অঙ্কন করিয়াছেন। শিল্পী মহাশয়দিগের সাহায্য না পাইলে পুস্তক-প্রকাশে বিঘ্ন ঘটিত। তাই এই সুযোগে তাঁহাদের ও প্রকাশক মহাশয়দিগের সমীপে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন
আশ্বিন, ১৩৩১

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচিপত্র

প্রথম কথা … … ১

শাখাশ্রেয়ী

কাক … … ৫

ছাড়িচাঁচা .. … ১৫

শালিক … … ২২

গো-শালিক ও গাং-শালিক … … ২৭

চড়ুই … … ৩০

খঞ্জন জাতি .. … ৩৪

দোয়েল . … ৩৬

ফিঙে … … ৩৯

ছাতারে . … ৪৫

বুল্‌বুল্‌ … .. ৪৯

হল্‌দে পাখী … … ৫২

কোকিল … … ৫৪

পাপিয়া ও কুকো … … ৫৯

টিয়া .. … ৬২

কাঠ্‌ঠোক্‌রা … … ৬৬

বসন্ত বউরি … … ৭০

নীলকণ্ঠ … … ৭৩

মাছরাঙা ৭৫
বাঁশপাতি ৭৮
টুন্‌টুনি ৮০
সাত-সয়ালি ৮২
ভরতপাখী ৮৩
তালচোঁচ ৮৪
আবাবিল ৮৭
বাবুই ৮৯
মধুপায়ী ৯৪

কপোত-জাতি

পায়রা ৯৮
হরিয়াল ১০২
ঘুঘু ১০৫
তিতির ও বটের ১০৮
ময়ূর ১১০
ধনেশ ১১৪
চিল ১১৬
শঙ্খ চিল ১২০
মাঠ চিল ১২২
শিক্‌রা . . ১২৪
বাজ .. . ১২৭
কোড়ল ... ১২৮
শকুন ১৩০
পেঁচা ১৩৫

কূলেচর

বক ১৪০
ডাহুক ১৪৮
জলপিপি ১৫১
কাদাখোঁচা ১৫৩
হাড়গিলা ১৫৪
মাণিকজোড় ও রামশালিক ১৫৬
অন্য কূলেচর পাখী ১৫৮
সারস ১৬০

সন্তরণকারী

পানকৌড়ি ১৬২
হাঁস ১৬৫
চকাচকি ১৭০
ডুবুরি ও নকিহাঁস ১৭২
শরাল ও বালিহাঁস ১৭৬
কড় হাঁস ১৭৮
ঘরাও পাখী ১৮০

বাংলার পাখী

প্রথম কথা

পাখী জগদীশ্বরের বড় সুন্দর সৃষ্টি। শকুন, হাড়গিলা প্রভৃতি বিশ্রী পাখী আছে বটে, কিন্তু অনেক পাখীই সুশ্রী। তাই লোকে সখ্ করিয়া তাহাদের পোষে।

আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়া কত পাখী উড়িয়া যায়, বাড়ীর কাছের গাছে বসিয়া কত পাখী কত রকম শব্দ করে, আমাদের মাঠে-ঘাটে কত রকম রকম পাখী চরিতে আসে, কিন্তু আমরা তাহাদের সকলের নাম জানি না। তা'ছাড়া তাহারা কি খায়, কোথায় থাকে, তাহারও সন্ধান রাখি না। ইহা অন্যায় নয় কি? পাখীরা ত আমাদেরি প্রতিবেশী। সমস্ত দিন আমাদের গ্রামেরই মাঠে-ঘাটে চরিয়া পেট ভরায়।

তাহাদের সব খবর আমাদের জানিয়া রাখা উচিত নয় কি? এই জন্য সাধারণ জানা-শুনা কতকগুলি পাখীর কথা তোমাদিগকে বলিব। সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় পনেরো হাজার রকমের পাখী আছে। ইহাদের প্রত্যেকের আকৃতিতে ও চলাফেরায় পার্থক্য আছে। এতগুলা পাখীর বিবরণ দিতে গেলে তিন-চারিখানা প্রকাণ্ড বই লেখার দরকার হয়। তাই এই ছোটো বইখানিতে তোমরা পৃথিবীর সব পাখীর পরিচয় পাইবে না।

যেমন শরীরের গড়ন, গায়ের রঙ্ ইত্যাদি দেখিয়া মানুষদের নানাজাতিতে ভাগ করা হয়, তেমনি পাখীদের আকৃতি ও চাল-চলন দেখিয়া তাহাদিগকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। সব পাখীর চাল-চলন একই রকম নয়, ইহা তোমরা লক্ষ্য কর নাই কি? কাক, বক, শকুন ও হাঁস, এই চারিটি পাখীর কথা বিবেচনা করা যাউক। ইহাদের প্রত্যেকেরই আকৃতি ও প্রকৃতি কি সমান? কাকের গায়ের রঙ্ কালো, ইহারা মরা জন্তু, ফল-মূল সবই খায়। আবার কখনো গাছের ডালে বসে, কখনো-বা মাটির উপরে চরিয়া বেড়ায়। বকের গায়ের রঙ্ সাদা, ঠ্যাং লম্বা। ইহারা গাছের ডালে বসে বটে, কিন্তু প্রায়ই জলাশয়ের ধারে বেড়াইয়া জীয়ন্ত পোকা-মাকড় ও মাছের খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা ফল-মূল পছন্দ করে না। শকুন প্রকাণ্ড পাখী; ইহাদের মাথাগুলা নেড়া। ইহারা মরা জন্তু-জানোয়ার

খায় বটে, কিন্তু বকদের মতো জলের ধারে বেড়ায় না। হাঁসের কথা ভাবিয়া দেখ; ইহাদের চেহারা কাক, বক বা শকুন কাহারো মতো নয়। হাঁসেরা গাছের ডালে বসিতে পারে না এবং জলের ধারে ঘুরিয়া পোকা-মাকড়ও ধরিয়া খায় না। ইহারা জলে সাঁতার দিয়া পাঁকে মুখ ডুবায় এবং সেখানকার শামুক গুগ্‌লি তুলিয়া খায়। তাহা হইলে দেখ, এই চারি রকম পাখীর আকৃতি ও চাল-চলনে কত তফাৎ।

যাহা হউক, পাখীদের এই রকম আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া নানা লোকে তাহাদিগকে নানা ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সে-সব ভাগের কথা আমরা তোমাদিগকে বলিব না। আমরা মোটামুটি চাল-চলন দেখিয়া পাখীদের শাখাশ্রয়ী, কপোত, শিকারী, কূলেচর ও সন্তরণকারী এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিলাম। যে-সব পাখী ডালে বসিতে পারে, তাহাদের শাখাশ্রয়ী নাম দেওয়া হইল। কাক, কোকিল, মাছরাঙা, হাঁড়িচাঁচা, চড়াই, বাবুই, বুল্‌বুল্‌,—ইহারা সকলেই শাখাশ্রয়ী। হরিয়াল, ঘুঘু, ময়ূর,—ইহারা সকলেই কপোত অর্থাৎ পায়রা জাতের পাখী; চিল, বাজ, শিকরা, প্যাঁচা ইত্যাদি পাখীরা পোকা-মাকড় ও জন্তু-জানোয়ার ধরিয়া খায়, তাই ইহাদিগকে শিকারী পাখী বলা হইল। কাদাখোঁচা, জলপিপি, ডাহুক, বক, সারস প্রভৃতি পাখীরা নদী ও খাল-বিলের ধারে বেড়াইয়া পোকা-মাকড় ও ছোটো মাছের সন্ধানে ঘোরে। তাই ইহাদের নাম দেওয়া হইল কূলেচর। চকাচকি, হাঁস,

ডুবুরি, পানকৌড়ি,—ইহারা জলের পোকা-মাকড় ও কেহ কেহ মাছও খায়, কিন্তু জলের ধারে চরিয়া বেড়ায় না; সাঁতার ও ডুব দিয়া জলের তলা হইতে শামুক-গুগ্‌লি ধরিয়া খায়। তাই এই রকম পাখীদের নাম দেওয়া হইল সন্তরণকারী।

শাখাপ্রেমী

কাক

আমাদের বাংলাদেশে কাক যত দেখা যায়, বোধ করি অন্য কোনো পাখী তত দেখা যায় না। খুব ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই লক্ষ্মীছাড়া পাখীর উৎপাতে অস্থির হইতে হয়। কাকদের পূর্ব্ববঙ্গের লোকে "কাউয়া" বলিয়াও ডাকে।

সাধারণ কাকদের তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও, তাই বোধ হয় উহাদের চেহারাখানা তোমরা ভালো করিয়া দেখ নাই। যে জিনিসকে আমরা সকল সময়েই কাছে পাই, চোখ খুলিয়া তাহাকে পরখ্ করি না, ইহা আমাদের বড় দোষ। পাতি-কাকদের চেহারা কিন্তু নিতান্ত মন্দ নয়। ইহাদের ঘাড় গলা পিঠ ও বুক ছাই রঙের পালকে ঢাকা থাকে। লেজ ডানা মাথা ইত্যাদি বাকি অংশ কুচ্‌কুচে কালো। ঠোঁটগুলি কিন্তু ভারি বিশ্রী। কাকের ডাক যদি কোকিলের ডাকের মতো মিষ্টি হইত, তাহা হইলে বোধ করি লোকে কাকগুলাকে খাঁচায় রাখিয়া পুষিত।
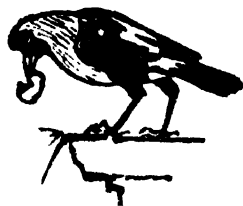
কাক

কাকেরা যত উৎপাতই করুক, তাহাদের কাছ হইতে যে আমরা কোনো উপকার পাই না, একথা বলা যায় না।

মরা ইঁদুর, বিড়াল এবং পচা খাবার বাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলেই কাকেরা তাহা ঠোঁটে করিয়া দূরে লইয়া যায় এবং সেগুলিকে খাইয়া হজম করিয়া ফেলে। তা'ছাড়া আরো অনেক নোংরা জিনিসও ইহারা খায়। তাই সেগুলি মাঠে-ঘাটে পচিতে পায় না। যদি কাক ও অন্য পশু-পক্ষীরা এই রকমে পচা ও নোংরা জিনিস খাইয়া নষ্ট না করিত, তাহা হইলে বোধ করি ঐ সব জিনিসের দুর্গন্ধে পৃথিবীতে টেঁকা দায় হইত। তাহা হইলে দেখ, কাকেরা আমাদের উপকারও করে। কিন্তু জ্বালাতন করে তার চেয়ে অনেক বেশি; সমস্ত দিন "কা—কা" শব্দে কানে তালা লাগাইয়া দেয়।

কাকেরা বড় চঞ্চল পাখী। তোমরা কখনো কাকদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছ কি? আমরা কিন্তু কখনো দেখি নাই। দুরন্ত ছেলেরা যেমন চুপ করিয়া বসিয়া কাহার বাড়ীতে গিয়া কাঁচা পেয়ারা ও টক্ কুল পাড়িয়া খাইবে ভাবিয়া লয়, কাকেরা কখনো কখনো চুপ করিয়া বসিয়া সেই রকমে দুষ্ট মতলব ঠিক করে। তার পরে ফস্ করিয়া উড়িয়া হয় ত তোমাদের রান্নাঘরের জানালায় বসিয়া খাবার চুরি করিবার জন্য উঁকি দিতে থাকে অথবা তোমাদের খোকার হাত হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া ছুট্ দেয়। ছোটো ছেলেমেয়েদের উহারা একটুও ভয় করে না।

গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়াদের কাকেরা যে কি-রকমে জ্বালাতন করে, একটু লক্ষ্য করিলেই তোমরা তাহা দেখিতে

পাইবে। তোমাদের গরুটি চরিয়া আসিয়া হয় ত গোয়াল-ঘরের আঙিনায় একটু শুইয়া আছে, ইহা দেখিয়া কাকদের হিংসা হয়; কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া নাক কান বা চোখ ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করে। গরু বেচারী চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে; হাজার গা-ঝাড়া বা শিং-নাড়া দিলেও কাক পালায় না। ইহা কি কম দুষ্টামির কথা! মনে কর, তুমি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছ, এখন যদি একটা কাঠি লইয়া তোমার নাকে কানে ও চোখে খোঁচা দিতে আরম্ভ করা যায়, ইহাতে তোমার রাগ হয় না কি? কাকদের দুষ্টামিতে গরুরাও বোধ করি খুব রাগ করে—কিন্তু কাকদের সঙ্গে ঝগড়ায় পারিয়া উঠে না। গরু মাঠে চরিতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে একটা কাক উড়িয়া আসিয়া তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিল,—ইহাও অনেক সময়ে দেখা যায়। কাকেরা বোধ হয় মনে করে, গরুগুলা তাহাদের ঘোড়া। তাই ঘোড়-সোওয়ারের মতো গরুর পিঠে চাপিয়া খানিক দূর যায় এবং তার পরে হঠাৎ উড়িয়া পালায়। দেখ, কাকেরা কত দুষ্ট। গরুর শিঙের উপরে চাপিয়া বেড়াইয়া আসিবে, এ-রকম সখও কাকদের মনে কখনো কখনো দেখা দেয়।

গ্রামের কোন্ পাড়ায় কি হইতেছে, আমরা তাহার খবর লই না। কিন্তু কাকদের দৃষ্টি এড়াইয়া গ্রামে কোনো কাজ করা শক্ত। কোন্ বাড়ীতে ভোজ হইতেছে, নিমন্ত্রণ না

হইলে আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু কাকেরা গৃহস্থের চলাফেরা ও ব্যস্ততা দেখিয়াই বুঝিয়া লয়, সেখানে একটা কিছু ব্যাপার আছে। তখন তাহারা বিনা নিমন্ত্রণেই সারি বাঁধিয়া প্রাচীরের বা ছাদের উপরে বসিয়া যায় এবং কোনো জায়গায় খাবারের জিনিস অসাবধানে থাকিলে, তাহা ঠোঁটে লইয়া পালায়।

গায়ে খুব জোর না থাকিলেও কাকদের সাহস অত্যন্ত বেশি। বাজ বা শিকরা প্রভৃতি মাংসাশী পাখীকে উড়িয়া আসিতে দেখিলেই, ইহারা চীৎকার সুরু করিয়া দেয় এবং সেই চীৎকারে এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে কাকেরা দলে দলে আসিয়া এক জায়গায় হয় এবং ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ করে। তাহারা কি বলে জানি না। বোধ করি বলে,—"ভারি অন্যায়! আমাদের কাছে বাজ পাখী আসিবে কেন? এ রাজ্য ত আমাদেরি!" যাহা হউক, শিকারী পাখীরা কাকদের এই চীৎকারে এক দণ্ডও সেখানে থাকিতে পারে না। বাড়ীতে একটা নূতন বিড়াল বা কুকুর আসিলে, বাড়ীর কাকের দল চীৎকার আরম্ভ করে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি বড় সহরের রাস্তায় যদি একটা লোক গাড়ি চাপা পড়িয়া পা ভাঙে, তবে সে-জায়গায় একে একে হাজার লোক জড় হইয়া যায়। কেহ হা-হুতাশ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে, কেহ বা উঁকি মারিয়া লোকটার চেহারা দেখে। পা-ভাঙা লোকটাকে যে কোলে তুলিয়া হাসপাতালে

রাখিয়া আসিবে, এমন বুদ্ধি কিন্তু প্রায়ই কাহারো মাথায় আসে না। কাকদের মধ্যে ঠিক্ এই রকমই দেখা যায়। কোনো রকমে যদি একটা কাকের পা বা ডানা ভাঙ্গিয়া যায়, অমনি পাড়ার সমস্ত কাক তাহার কাছে জমা হইয়া চীৎকারে আকাশ ফাটাইতে থাকে। কিন্তু পা-ভাঙ্গা কাকটাকে একটুও যত্ন করে না। বোধ হয়, পরস্পর মুখ-চাওয়া-চাহি করিয়া বলে,—“হায় হায়! একি হ’ল।”

আমাদের মধ্যে একদল লোক ভয়ানক ভূতের ভয় করে,—তাই তাহারা রাত্রিতে ভয়ে ঘরের বাহির হইতে চায় না। মরা কাকের ডানা ও শরীরকে কাকেরা ঠিক্ ভূতের মতোই ভয় করে। কোনো জায়গায় একটা কাকের ডানা ঝুলাইয়া রাখিলে, কাকেরা ভয়ে তাহার ত্রিসীমানাতেও আসে না। ফসলের ক্ষেতে কড়াই, গম ইত্যাদির অঙ্কুর বাহির হইলে, কাকের দল আসিয়া সেগুলিকে খুঁটিয়া খায়। তাই কাকদের ভয় দেখাইবার জন্য চাষারা কখনো কখনো বাঁশ পুতিয়া তাহাতে কাকের ডানা ঝুলাইয়া রাখে, ইহা তোমরা দেখ নাই কি?

বাড়ীতে একটা নূতন কুকুর আসিলে পোষা কুকুরগুলি তাহাকে কি রকমে তাড়া করে, তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। তখন বোধ করি পোষা কুকুরগুলি মনে করে,—“এ বাড়ী আমাদের, এখানে অন্য কুকুরকে আসিতে দিব না।” কাক-দের মধ্যেও এই রকম দেখা যায়। এক-এক দল কাক

এক-এক বাড়ীতে গিয়া আড্ডা করে। এক বাড়ীর কাক যদি কোনো কারণে অন্য বাড়ীতে চরিতে যায়, তবে সে এক দণ্ডও সেখানে থাকিতে পারে না। সে বাড়ীর কাকেরা তাহাকে ঠোক্‌রাইয়া তাড়াইয়া দেয়। কাকেরা যে এই রকমে বাড়ী ভাগ করিয়া চরিতে বাহির হয়, তাহা তোমরা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে। কাকের ডানার পালকের রঙ্ মিশ্‌মিশে কালো। কিন্তু কখনো কখনো এক-একটা কাকের ডানায় দুই একটা সাদা পালকও দেখা যায়। এই রকম সাদা পালক-ওয়ালা একটা কাককে আমাদের বাড়ীতে পাঁচ বৎসর ধরিয়া আসিতে দেখিয়াছি। সে প্রতিদিনই খুব ভোরে অন্য কাকদের সঙ্গে আসিত এবং সন্ধ্যার সময়ে উড়িয়া ঘুমাইতে যাইত। পাঁচ বৎসরের মধ্যে একদিনও তাহাকে অনুপস্থিত দেখি নাই। তার পরে হঠাৎ একদিন তাহাকে দেখা গেল না। বোধ করি, ঝড়ের মধ্যে উড়িতে গিয়া তাহার পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, লক্ষ্য করিলে হয় ত তোমরাও দেখিবে, একই দল কাক দিনের পর দিন, তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া দিন কাটায়।

অধিকাংশ পাখীই বারো মাস বাসায় থাকে না। ডিম পাড়িবার সময় হইলে তাহারা বাসা বাঁধে এবং সেখানে দুই-এক মাস বাচ্চাদের পালন করিয়া বাসা ছাড়িয়া দেয়। তখন গাছের ডালে বসিয়া তাহাদিগকে রাত্রি কাটাইতে হয়। কাকেরাও এই রকমে বৎসরের বারো মাসের মধ্যে দশ মাস

গাছের ডালে বসিয়া হিমে-শীতে রাত কাটায় এবং বৃষ্টিতে ভিজে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ইহারা রাত্রি হইলে সম্মুখে যে গাছ পায় তাহাতে বসিয়া রাত কাটায়। কিন্তু তাহা নয়। গ্রামের বাহিরে নির্জ্জন জায়গায় ইহাদের এক-একটা গাছ ঠিক্ করা থাকে ; সন্ধ্যা হইলে এক গ্রামের বা দুই-তিন গ্রামের কাকেরা চারিদিক হইতে উড়িয়া সেই গাছের ডালে বসে। এই গাছ ছাড়া অন্য গাছে তাহারা রাত কাটাইতে চায় না।

তোমরা ঐ রকম গাছ দেখ নাই কি ? কেবল যে কাকেরাই এই গাছে থাকে, তাহা নয়। শালিক ও বকদেরও একই গাছে এক সঙ্গে থাকিতে দেখা যায়। তোমাদের গ্রামের বাহিরে পুকুরের ধারে এই রকম গাছ খোঁজ করিলে হয় ত দেখিতে পাইবে। শালিকেরা রাত কাটাইবার জন্য সন্ধ্যা-বেলায় গাছে আসিলে, ভয়ানক চেঁচামেচি এবং পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি করে। কিন্তু কাকেরা তাহা করে না। গ্রাম হইতে দলে দলে ফিরিয়া প্রায়ই কাছের একটা গাছে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া সকলে চেঁচাইয়া লয়। বোধ হয়, সমস্ত দিনে কে কাহার বাড়ীতে গিয়া কি রকম দুষ্টামি করিয়াছে, সেই সব কথাই পরস্পর বলাবলি করে। তার পরে উহাদের সভা ভঙ্গ হয় এবং নিঃশব্দে সে গাছ ছাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট গাছের ডালে বসিয়া ঘুমাইবার আয়োজন করে।

কোকিল ও শালিকদের ঘুম বড় পাত্‌লা, রাত্রে অকারণে

হঠাৎ তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তোমরা যেমন রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া কখনো কখনো ঘুমের ঘোরে চেঁচাইয়া উঠ, দুই একটা শালিক প্রায়ই সেই রকম চেঁচাইয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে গাছের সব শালিক এক সঙ্গে চীৎকার আরম্ভ করে। ইহা তোমরা শুন নাই কি? কিন্তু কাকদের মধ্যে এই রকমে ঘুমের ঘোরে চীৎকার করা প্রায়ই শুনা যায় না। খুব ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত্রিতে কখনো কখনো ইহাদের দুই একটা ডাক শুনা যায়। ভোরের আলো চোখে পড়িলে কাকেরা কিন্তু আর ঘুমাইতে পারে না। বোধ হয় তাহারা জ্যোৎস্নার আলো-কে ভোরের আলো ভাবিয়া চীৎকার সুরু করে।

খুব ভোরে কাকেরা কি রকমে গাছ ছাড়িয়া চরিতে বাহির হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। যখন দূরের মানুষ চেনা যায় না, এ রকম অন্ধকার থাকিতেই তাহারা দলে দলে গাছ ছাড়িয়া বাহির হয়। কিন্তু ইহাদিগকে যে-দিকে ইচ্ছা সে-দিকে যাইতে দেখা যায় না। দেখিলেই বুঝা যায়, প্রত্যেক দলেরই এক-একটা গ্রাম চরিবার জন্য ঠিক্ থাকে। সেই সব গ্রাম লক্ষ্য করিয়া তাহারা ছুট্ দেয়। তার পরে গ্রামে পৌঁছিয়া কেহ গৃহস্থের বাড়ীতে, কেহ খাবারের দোকানে, কেহ বা হোটেল-খানায় গিয়া আহারের সন্ধান করে। নদী বা মাঠের ব্যবধান কাকেরা গ্রাহ্যই করে না। এপারের কাক নদীর ওপারের গাছে রাত কাটাইয়া আসে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়।

কাকের গায়ে কি রকম দুর্গন্ধ, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। যেমন নোংরা জিনিস খায়, তেমনি দুর্গন্ধ; কাছে দাঁড়ানো যায় না। কিন্তু কোনো দিনই ইহাদের স্নান বাদ যায় না। তোমরা কাকের স্নান দেখ নাই কি? আমরা যেমন সমস্ত দিন খাটিয়া-খুটিয়া কখনো কখনো সন্ধ্যার সময়ে গা-হাত-পা ধুই ও স্নান করি, কাকেরাও ঠিক্ তাহাই করে। বাসায় ফিরিবার আগে ইহারা নদী বা পুকুরের জলে নামিয়া ঠোঁট্ দিয়া গায়ে জল ছড়ায় এবং দুই ডানা মেলিয়া ফট্‌ফট্ শব্দ করে। কাকদের এই রকম স্নান দেখা বড় মজার। সমস্ত গা ইহারা কখনই ভিজায় না,—তাই গায়ের গন্ধ যায় না।

দাঁড়কাক তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পাতি-কাকদের চেয়ে ইহারা আকারে বড়, এবং গড়ন যেন কতকটা লম্বাটে রকমের। ইহাদের সমস্ত শরীরটা মিশ্‌মিশে কালো। দাঁড়কাকেরা সাধারণ কাকদের মতো ছেলেমানুষী বা দুষ্টামি করে না। ইহাদের মেজাজ খুব গম্ভীর। তা' ছাড়া সাধারণ কাকদের মতো কখনই এক গাছে থাকিয়া ইহারা রাত্রি কাটায় না। ইহাদের বাসাও খুব নিরিবিলি জায়গায় দেখা যায়। দাঁড়-

দাঁড়কাক

কাকেরা যতই ভালো হউক,—ইহাদের গলার স্বর কিন্তু বড় কর্কশ। দুপুরবেলায় নিমগাছের মাথায় চাপিয়া যখন

"কোয়াও—কোয়াও" শব্দে চীৎকার করে, তখন বাস্তবিকই ইহাদিগকে গুলি করিয়া মারিতে ইচ্ছা হয়। ইহারা পাতি-কাকদেরই মতো নোংরা জিনিষ খাইতে ভালবাসে। নদীর স্রোতে মরা গরু-বাছুর ভাসিয়া যাইতেছে,—দুই-তিনটা দাঁড়কাক তাহার উপরে চড়িয়া পচা মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। দাঁড়কাকদের এই কাণ্ড দেখিতে ভারি বিশ্রী লাগে। নির্জ্জন জায়গায় দু'-একটা দাঁড়কাককে এই রকমে মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে দেখিলে ভয়ও করে। তাই বোধ করি লোকে বলে, দাঁড়কাক যমের দূত।

সাধারণ কাকেরা কি প্রকার দুষ্ট ও সাহসী, তোমাদিগকে তাহা আগেই বলিয়াছি। চিলের মতো ভয়ানক পাখীকেও ইহারা ভয় করে না। বিনা কারণে কাকেরা চিলের পিছু-পিছু গিয়া তাহার লেজ ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। কোকিল ও প্যাঁচাগুলাকে ত ইহারা জ্বালাতন করিয়া অস্থির করেই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দাঁড়কাকদের কাছে পাতি-কাকেরা খুব জব্দ থাকে। ইহারা দাঁড়কাকদের গায়ে খোঁচা মারিতেছে, বা লেজ ধরিয়া টানি-তেছে, ইহা আমরা কখনও দেখি নাই।

যাহা হউক, কাকদের এত দুষ্টামি থাকিলেও তাহারা বাচ্চাদের বড় ভালবাসে। কোকিলেরা লুকাইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। কাকেরা ডিমগুলিকে নিজেদেরি ডিম ভাবিয়া তাহাতে তা দেয়, এবং তাহা ফুটাইয়া বাচ্চা

বাহির করে। এই পরের বাচ্চাদেরও কাকেরা খুব যত্নে পালন করে। বোধ করি বাচ্চাদের খুব ভালবাসে বলিয়াই কোন্‌টি নিজের বাচ্চা এবং কোন্‌টিই বা কোকিলের বাচ্চা, তাহা কাকেরা চিনিতে পারে না।

বড় হইয়া উড়িতে শিখিলেও কাকদের বাচ্চা বাপ-মার কাছ ছাড়া হইতে চায় না। আকাশ-পাতাল হাঁ করিয়া তাহারা কেবলই খাবার চায়। আমাদের বড় ছেলেরা যদি এই রকমে বাপ-মার কাছে খাবার চাহিত, তাহা হইলে হয় ত বাবা ও মা তাহাদের গালে চড় মারিতেন। কিন্তু কাকদের বাপ-মা সে-রকম কিছুই করে না। বুড়ো বুড়ো ছেলের অনেক আব্‌দার, তাহারা খুব শান্ত হইয়া সহ্য করে। তাহাদের মুখের মধ্যে নিজেদের ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া মুখের খাবার তাহাদের খাওয়ায়। এজন্য কাকদের সত্যই সুখ্যাতি করিতে হয়।

কাকদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভাবও খুব বেশী। এক-এক জোড়া কাক সমস্ত বৎসরই কাছে কাছে থাকে এবং একই জায়গায় চরিয়া বেড়ায়। অন্য পাখীদের মধ্যে ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। তাহাদের অনেকেই ডিম-পাড়ার সময়ে কেবল স্ত্রী-পুরুষে একত্র থাকে। তার পরে বাচ্চা বড় হইলে কেহ কাহারো সন্ধান রাখে না। অন্য কাজ না থাকিলে স্ত্রী ও পুরুষ কাক কাছাকাছি হইয়া একে অন্যের গায়ে ও মাথায় ঠোঁট দিয়া সুড়সুড়ি দিতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। ইহা

দেখিলে মনে হয়, যেন কাকেরা পরস্পরকে আদর করিতেছে। তাহা হইলে দেখ, কাকদের আগাগোড়াই যে দুষ্টামিতে ভরা, তাহা নয়। ইহাদের দুই-একটা ভালো গুণও আছে।

এত চালাক-চতুর পাখী হইলেও কাকদের বাসাগুলি কিন্তু ভারি বিশ্রী। বাসা তৈয়ারিতে তাহারা একটুও বুদ্ধি খরচ করিতে পারে না। শুক্‌নো সরু ডাল, ঘাস, খড়, কাগজের কুচা, আরো কত ছাই-ভস্ম দিয়া তাহারা বাসা বানায়। কখনো কখনো লোহার তার ও টিনের টুক্‌রাও তাহাদের বাসায় পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলিকে বাসায় পরিপাটি করিয়া সাজানো দেখা যায় না। কোনো রকমে সেগুলিকে ডালে আট্‌কাইয়া তাহারি উপরে কাকেরা পাঁচ-ছয়টা করিয়া ফিকে নীল রঙ্গের ডিম পাড়ে। কোকিলের ডিম কাকের ডিমের চেয়ে ছোট এবং তাহার রঙ্‌ কতকটা সবুজ এবং সবুজের উপরে আবার হল্‌দে পোঁচও থাকে। কাকেরা কোকিলের ডিমকে নিজের ডিম ভাবিয়া কেন যে তাহাতে তা দেয়, তাহা বুঝা যায় না। অনেক পাখীদেরই স্ত্রী ও পুরুষে মিলিয়া বাসা বাঁধে। কিন্তু কাকদের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। স্ত্রী-কাকেরাই খড়কুটা কুড়াইয়া বাসা বাঁধিতে খাটিয়া মরে। পুরুষ-পাখী নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া স্ত্রীর কাজের তারিফ করে। কিন্তু বাসায় ডিম পাড়া হইলে পুরুষ-কাকেরা আর ফাঁকি দিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। তখন তাহাদিগকে বাসার চারিদিকে ঘুরিয়া ডিমের পাহারা

দিতে হয়। ফিঙে প্যাঁচা চিল চড়ুই পায়রা ঘুঘু সকল পাখীই কাকদের উপরে ভারি চটা। তাই সব পাখীই সুবিধা পাইলে কাকদের বাসায় গিয়া ডিম নষ্ট করার চেষ্টা করে। ডিম হইতে কাকদের যে-সব বাচ্চা বাহির হয়, তাহাদের গায়ের রঙ্ হয় কতকটা গোলাপি, কিন্তু কোকিলের বাচ্চাদের রঙ্ হয় কালো। কাকেরা এই রঙ্ দেখিয়াও কোন্‌টি নিজেদের বাচ্চা ও কোন্‌টিই বা কোকিলের বাচ্চা ঠিক্ করিতে পারে না। ইহাতে বড় আশ্চর্য্য লাগে। তা' ছাড়া কোকিলের বাচ্চারা যত শীঘ্র বড় হয়, কাকের বাচ্চারা তত শীঘ্র বড় হয় না। আমরা ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বোকা কাকেরা তাহা একটুও বুঝিতে পারে না!

হাঁড়িচাঁচা

আমরা যাহাকে হাঁড়িচাঁচা বলি, তাহার যে কত রকম নাম আছে, তাহা বোধ করি বলিয়াই শেষ করা যায় না। হাঁড়িচাঁচাদের কোট্রি, টাকাচোর, কাশকুশি, ক্যাচ্-কাও, মহালাট্ ইত্যাদি অনেক নামে ডাকা হয়।

হাঁড়িচাঁচারা কাকবর্গেরই পাখী। একটু খোঁজ করিলে তোমরা গ্রামের জঙ্গলে বা বাগানে ইহাদের দেখিতে পাইবে। লম্বায় ইহারা প্রায় এক হাতের কাছাকাছি,—ইহার মধ্যে বোধ করি লেজটাই আধ হাত লম্বা। হাঁড়িচাঁচার বুক ও গলার পালক প্রায় কালো এবং শরীরের আর অংশের রঙ্ কতকটা খয়েরি। ডানার কতক পালকের রঙ্ আবার ধূসরও আছে। একবার বাগানে গিয়া তোমরা এই পাখীকে লক্ষ্য করিয়ো। গায়ে নানা রকম রঙ্ থাকে বলিয়া ইহাদিগকে দেখিতে সুন্দরই বোধ হইবে। লেজের মাঝের দুইটি পালক লম্বায় প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি। লেজের অন্য পালকগুলি লম্বায় কমিতে কমিতে লেজের শেষে খুব ছোটো হইয়া গিয়াছে। তাই লেজ দেখিলে মনে হয়, তাহার পালকগুলি যেন থাকে-থাকে সাজানো রহিয়াছে।

যখন লেজের পালক খুলিয়া ইহারা ঢেউয়ের মতো গতিতে এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যায়, তখন ইহাদিগকে মন্দ দেখায় না। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, লেজের পালকের শেষে একটা কালো রঙের ছোপ আছে।

হাঁড়িচাঁচার ডাক তোমরা শুনিয়াছ কি? ইহারা নানা সুরে ডাকিতে পারে। হাতা দিয়া হাঁড়ি চাঁচিতে থাকিলে যে "ক্যাঁচ ক্যাঁচ" শব্দ হয়, ইহারা প্রায়ই সেই রকম বিশ্রী স্বরে চীৎকার করে। এই ডাক হইতেই এই পাখীদের নাম হাঁড়িচাঁচা হইয়াছে। ইহা ছাড়া "টুক্-লি টুক্-লি" এই রকম শব্দও তাহাদের গলা হইতে বাহির হয়। এই ডাক শুনিতে বড় মিষ্ট। বোধ করি, ইহাই হাঁড়িচাঁচাদের গান। পাতার আড়ালে নিরিবিলি বসিয়া ইহারা ঐ রকমে ডাকিতে থাকে।

গলার স্বর ও গায়ের রঙ্ ভালো হইলেও পাখীগুলা কিন্তু ভারি বদ্। অন্য পাখীদের ডিম চুরি করিয়া খাওয়া ইহাদের একটা প্রধান দোষ। এমন কি, কাক প্যাঁচা প্রভৃতি পাখীরাও ডিম পাড়িলে হাঁড়িচাঁচাদের ভয়ে অস্থির হইয়া থাকে। পায়রা ও ঘুঘুদের বাচ্চা ও ডিম এই ডাকাতের দলের উৎপাতে বাসায় রাখা দায় হয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, হাঁড়িচাঁচারা কেবল অন্য পাখীদের ডিম ও বাচ্চা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু তাহা নয়। ফল-ফুল পোকা-মাকড়

কিছুই তাহাদের গ্রাস হইতে মুক্তি পায় না। তা' ছাড়া টিক্‌টিকি গিরগিটি আরসুলার ত কথাই নাই। সাম্‌নে পাইলেই এগুলিকে তাহারা খাইয়া ফেলে। শুনিয়াছি, ছোটো ছোটো সাপ সাম্‌নে পাইলে হাঁড়িচাঁচারা খাইতে ছাড়ে না। ইহাদের ছোটো পেটগুলি যেন কিছুতেই ভরিতে চায় না,—তাই সমস্ত দিনই কেবল খাই-খাই করিয়া বেড়ায়। শুনিয়াছি, খাবার বেশি পাইলে ইহারা অসময়ের জন্য যেখানে-সেখানে লুকাইয়া রাখে।

হাঁড়িচাঁচাদের বাসা তোমরা দেখিয়াছ কি? বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগানের গাছের উঁচু ডালে ইহারা বাসা বাঁধে। ইহাদের বাসায় হাব্‌জা-গোব্‌জা ছাই-ভস্ম ছাড়া আর বেশি কিছু দেখা যায় না। গাছের উঁচু ডালে বাসা থাকে বলিয়া অন্য জন্তু-জানোয়ারে বা পাখীতে ইহাদের ডিম নষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হয় না—কাক কোকিল ফিঙে চিল সকলেই হাঁড়িচাঁচাদের ডিম চুরি করিবার জন্য বাসার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাই যখন স্ত্রী-হাঁড়িচাঁচা ডিমে তা দিতে বসিয়া যায়, তখন পুরুষটা বাসার কাছের ডালে বসিয়া পাহারা দেয়। এই সময়ে যদি কেহ গাছের তলায় যায়, তবে পাহারাওয়ালা পাখী ফস্‌ করিয়া উড়িয়া তাহাকে ঠোকর মারে। আমরা ছেলেবেলায় বাসার কাছে গিয়া একবার হাঁড়িচাঁচার ঠোকর খাইয়াছিলাম। ইহাদের ঠোঁটে ভয়ানক ধার,—যেখানে ঠোকর দেয় সেখান হইতে রক্ত

বাহির হয়। হাঁড়িচাঁচাদের ডিম বোধ করি তোমরা দেখ নাই। আমরা একবার বাসা হইতে পাড়িয়া দেখিয়াছিলাম, ইহাদের ডিম সবুজ; সেই সবুজের উপর আবার ছিটা-ফোঁটা থাকে। শুনিয়াছি, কখনো কখনো ইহাদের ডিম গোলাপি রঙেরও হয়।

শালিক

কাক যেমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, শালিকও সেই রকম দিনের বেলায় মাঠে-ঘাটে ও বাড়ীতে প্রায়ই নজরে পড়ে।

তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় যখন শালিকের দল চরিয়া বেড়াইবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো। দেখিতে পাইবে, ইহাদের বুকের কতকটা অংশ, গলা এবং মাথা কালো পালকে ঢাকা। ডানা ত্নখানির উপরটাও কালো; ইহা ছাড়া শরীরের অন্য অংশ গাঢ় খয়েরি রঙের পালকে ঢাকা। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি শালিকের গায়ে সাদা পালক নাই। কিন্তু তাহা নয়, যখন ইহারা ডানা গুটাইয়া চরিয়া বেড়ায় তখন প্রত্যেক ডানায় একটা করিয়া সাদা পালক দেখা যায়। তা' ছাড়া যখন ইহারা ডানা মেলিয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যায়, তখন ডানার তলায় অনেক সাদা পালক নজরে পড়ে। লেজের পালকের ডগাগুলির রঙ্‌ও আবার সাদা। শালিকদের পা ও ঠোঁটের রঙ্ বড় সুন্দর। ঠিক্ যেন কাঁচা হলুদের মতো। চোখের নীচেকার রঙ্‌ও হল্‌দে।

শালিকদের চলা তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারা প্রায়ই চড়ুইদের মতো লাফাইয়া চলে না। বাগানের ঘাসের মধ্যে যখন পোকা খুঁজিয়া বেড়াইবে, তখন লক্ষ্য করিয়ো।

দেখিবে, ইহারা আমাদেরি মতো একে একে পা ফেলিয়া চলে এবং দরকার হইলে দৌড়াইয়া বেড়ায়। শালিকদের পরস্পরের মধ্যে ভাব না থাকিলেও চরিবার সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাহির হয়। আমাদের বাড়ীর সম্মুখের মাঠে একদিন পঁচাত্তরটা শালিককে এক জায়গায় চরিতে দেখিয়াছিলাম।

এক সঙ্গে অনেকে চরিতে বাহির হইলেও শালিকেরা ভয়ানক ঝগড়াটে পাখী। ছোটো ছেলেরা যেমন কখনো পরস্পর হাসিখুসি করে, আবার সামান্য কারণে কখনো মারামারি জুড়িয়া দেয়, ইহাদের মধ্যে ঠিক্ সেই রকমটিই দেখা যায়। কোনো কারণ নাই, হঠাৎ দুইটা শালিক রাগিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পরস্পরকে ঠোকর দিতে আরম্ভ করিল, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। পালোয়ানেরা কুস্তির সময়ে ল্যাঙ্ মারিয়া একে অন্যকে হারাইতে চেষ্টা করে। ইহা তোমরা হয়ত দেখিয়াছ। শালিকেরা ঝগড়ার সময়ে সেই রকমে পায়ে পা বাধাইয়া লড়াই আরম্ভ করে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ঘর-সংসার পাতিয়া ডিম পাড়া ও বাসা বাঁধার সময় আসে, তখনি এই রকম ঝগড়া-ঝাঁটি বেশি দেখা যায়। মনে কর, তিন-চারিটা পুরুষ শালিকের মধ্যে কেবল একটা স্ত্রী-শালিক আছে। এখন একটি স্ত্রী-শালিক কোন্ পুরুষের সঙ্গে থাকিয়া বাসা বাঁধিবে ও ডিম পাড়িবে ইহা লইয়াও উহাদের মধ্যে মারামারি বাধে। কিন্তু যখন

মেজাজ ভালো থাকে, তখন শালিকদের খুব সুশীল ও শান্ত পাখী বলিয়াই বোধ হয়।

শালিকদের গলার স্বর এক রকম নয়। ভয় পাইলে ইহারা "চ্যাঁ—চ্যাঁ" করিয়া যে শব্দ করে তাহা অতি বিশ্রী। কিন্তু যখন পেট ভরিয়া পোকা খাইয়া ডালে বসিয়া থাকে, তখন ইহাদের গলা হইতে যে আওয়াজ বাহির হয়, তাহা বেশ মিষ্ট। বোধ করি ইহাই তাহাদের গান-গাওয়া। শালিক-দের চুর্-চুর্, কিচি-কিচি-মিচি, কক্-কক্-কক্,—এই রকম গান তোমরা শুন নাই কি? গানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে আবার গায়ের পালকগুলিকে ফুলাইতে এবং ডানা নাড়াইতেও দেখা যায়। ইহাদের এই গান-গাওয়া দেখিলে সত্যই হাসি পায়। গানে না আছে তাল, না আছে সুর;—আবার সঙ্গে সঙ্গে কালোয়াৎদের মতো মুখ-ভঙ্গী!

শালিক

শালিকেরা কি খায়, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। ইহারা ডাল, ভাত, ধান, গম, যব হইতে আরম্ভ করিয়া পোকা-মাকড় সব জিনিসই খায়; কিন্তু কাকদের মতো নোংরা জিনিস কখনই ছোঁয় না। তার পরে চিল-শকুনের মতো ভাগাড়ে গিয়া মরা জন্তুর মাংসও টানাটানি করে না। পোকা-মাকড় খায় বটে, কিন্তু যে-সে পোকা খায় না। ফড়িং এবং গাছের ও ঘাসের মধ্যেকার সবুজ রঙের পোকাই ইহারা

বেশি পছন্দ করে। তাহা হইলে বলিতে হয়, পাখীদের মধ্যে শালিকেরা খুব সাত্ত্বিক।

শালিকেরা চরিয়া আসিয়া কি রকমে এক গাছে রাত কাটায়, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। সন্ধ্যার সময়ে গাছে ফিরিলে উহারা যে কিচি-মিচি শব্দ করে সত্যই তাহাতে যেন কান জ্বালা করিতে থাকে। কিন্তু গভীর রাত্রিতে কখনো কখনো উহারা গাছ হইতে যে ঝঙ্কার দিয়া উঠে, বিছানায় শুইয়া তাহা শুনিতে মন্দ লাগে না। বোধ করি শালিকদের খুব গাঢ় ঘুম হয় না,—তাই ভোর হইয়াছে ভাবিয়া মাঝে মাঝে সকলকে জাগাইয়া তোলে।

কাকেরা যেমন গ্রাম ও বাড়ী ভাগ করিয়া চরিয়া বেড়ায়, বোধ করি শালিকেরাও তাহাই করে। একটা খোঁড়া শালিককে তিন বৎসর ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে রোজই আসিতে দেখিয়াছি। সে ঠিক্ ভোরে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীর উঠানে বা বাগানে চরিয়া বেড়াইত। তার পরে হঠাৎ একদিন তাহাকে আর দেখা গেল না। সে কোন্ গাছে রাত্রি কাটাইত তাহা জানা ছিল না। জানা থাকিলে তাহার সন্ধান লইতাম।

শালিকের বাসা হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। বৎসরের মধ্যে নয় মাস এ-গাছে সে-গাছে রাত কাটাইয়া বৈশাখ মাস হইতে আষাঢ়ের কিছুদিন পর্য্যন্ত ইহারা বাসায় থাকে। চেষ্টা করিলে এ সময়ে তোমাদের বাড়ীর বারান্দার কড়ি-

কাঠের ফাঁকে বা বাগানের গাছে ইহাদের বাসা দেখিতে পাইবে। গাছের ফোকরেও শালিকেরা বাসা বাঁধে। কিন্তু বাসাগুলিতে একটুও কারিগরি দেখিতে পাওয়া যায় না। খড়-কুটা, সাপের খোলস, নেকড়া-কানি যাহা ঠোঁটের গোড়ায় পাওয়া যায়, তাহাই কুড়াইয়া আনিয়া ইহারা সেগুলির উপরে বসিবার মতো একটু জায়গা করিয়া লয় এবং তাহাতেই নীল রঙের তিন চারিটি করিয়া ডিম পাড়ে। গ্রাম ছাড়া ঘোর জঙ্গলে ইহারা প্রায়ই বাসা বাঁধে না।

গো-শালিক ও গাংশালিক

গো-শালিকেরা সাধারণ শালিকেরই জাত-ভাই, কিন্তু চেহারা অন্য রকম। ইহারা কখনই অন্য শালিকদের মতো গৃহস্থ বাড়ীতে চরিতে আসে না। ঝাঁকে ঝাঁকে মাঠে বা বাগানে চরিয়া বেড়ায়। তোমরা বাগানে খোঁজ করিলে গো-শালিকদের দেখিতে পাইবে। ইহাদের ডানা ও শরীরের অনেক স্থানই প্রায় কালো। দুই গালের, মেরুদণ্ডের ও পিছন দিকের পালকের রঙ্ সাদা। এই সাদায়-কালোতে গো-শালিকদের মন্দ দেখায় না। ইহাদের ঠোঁটগুলির রঙ্ কিন্তু কমলা লেবুর রঙের মতো লাল। দুই চোখের পিছনের রঙ্ও ঐ রকম লাল। পূর্ব্ববঙ্গে এই পাখীদের "চম্না" শালিক বলে।

সাধারণ শালিকরা কত চঞ্চল তাহা তোমরা জানো। গো-শালিকেরা সাধারণ শালিকদের চেয়েও চঞ্চল। আমরা ইহাদিগকে কখনই এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে দেখি নাই। দৌড়াদৌড়ি ও ছুটাছুটি করিয়াই ইহারা সমস্ত দিন কাটাইয়া দেয়।

গাছের উপরে গো-শালিকেরা বিশ্রী করিয়া বাসা বাঁধে। লোকের বাড়ীতে ইহাদের বাসা কখনই দেখা যায় না। তা'ছাড়া তোমরা কখনই গাছের উঁচু ডালেও এই বাসা দেখিতে পাইবে না। আট-দশ হাত উঁচুতে খড়-কুটা ও ময়লা ন্যাকড়া-কানি দিয়া ইহাদিগকে গাছের ডালে বাসা বাঁধিতে দেখা যায়। একই গাছে ছয়-সাতটি গো-শালিকে বাসা বাঁধিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। যেমন ইহারা এক সঙ্গে চরিয়া বেড়ায়, তেমনি একই গাছে বাসা বাঁধে।

গাং-শালিক তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদিগকে দেখিতে অনেকটা সাধারণ শালিকদেরই মতো, তবে গায়ের রঙ্ খয়েরি নয়, কতকটা ধূসর এবং ঠোঁট ও চোখের গোড়ার রঙ্ লাল্‌চে। গাং-শালিকদের পুষিলে টিয়া ও ময়নাদের মতো কথা বলিতে শিখে। অনেক দিন আগে আমরা একটা গাং-শালিক পুষিয়াছিলাম। সে "রাধা কৃষ্ণ" "রাম রাম" এই রকম অনেক কথা বলিতে শিখিয়াছিল। ইহাদিগকেও তোমরা গৃহস্থের বাড়ীতে বা বাগানে চরিতে দেখিবে না। নদীর ভাঙনের গায়ে গর্ত্ত খুঁড়িয়া এবং তাহাতে খড়কুটা জমা করিয়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাসা করে এবং তাহাতেই ইহারা ডিম পাড়ে। নদীর ধারে বেড়াইতে গেলে তোমরা ইহাদিগকে ঝাঁকে ঝাঁকে কিচি-মিচি চীৎকার করিয়া চরিতে দেখিবে। সাধারণ শালিকদের ডিমের মতো গাং-শালিকদের ডিমের রঙ্‌ও নীল। বাচ্চাদের চোখের গোড়ায় লাল রঙ

দেখা যায় না,—বড় হইলে ঐ জায়গার চাম্‌ড়ার রঙ্‌ লাল হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা যখন ছেলেবেলায় নৌকায় করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতাম, তখন নদীর ভাঙনের গায়ে শত শত গাং-শালিকের গর্ত্ত দেখিতে পাইতাম। তোমরা নদীর ধারে বেড়াইতে গেলে গাং-শালিকদের বাসা দেখিতে পাইবে।

চড়ুই

এইবারে তোমাদিগকে চড়ুইদের কথা বলিব। সমস্ত দিনই তোমরা এদের দেখিতে পাও এবং চীৎকার শুনিতে পাও। তাই এদের সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

পুরুষ ও স্ত্রী চড়ুইদের চেহারা ঠিক এক রকম নয়। ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? পুরুষ পাখীদের দুই গাল এবং ঘাড়ের দুইটা দিক্ সাদা। কিন্তু গলা কালো এবং মাথার ও পিছনের পালক আবার ছাই রঙের। ডানা ও লেজের রঙ্ যেন কতকটা বাদামি। দেখ, কত রকম রঙের পালক ছোটো চড়াই পাখীর গায়ে থাকে। চোখের উপরের এবং ঘাড়ের পালক আবার পেয়ালা রঙের।

স্ত্রী-চড়ুইদের গায়ের রঙে কিন্তু এত বাহার নাই। ইহাদের গায়ের উপরকার পালকের রঙ্ বাদামি ও সাদায় মিশানো। কিন্তু পেটের তলা প্রায় সাদা। উড়িবার সময়ে স্ত্রী ও পুরুষ দুই পাখীরই ডানার নীচে সাদা পালক দেখা যায়।

চড়ুইরা মাটিতে বেড়াইবার সময়ে লাফাইয়া চলে।

ইহারা শালিকদের মতো পা ফেলিয়া হাঁটিতে জানে না। শালিকদের মতো চড়ুইরাও দল বাঁধিয়া চরিতে বাহির হয়। কিন্তু ডিম পাড়িবার আগে যখন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগে, তখন কেহ কাহাকে ক্ষমা করে না। শালিকদের মতো পায়ে পা বাধাইয়া চীৎকার করিতে করিতে মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং ঠোক্‌রাঠুক্‌রি করে।

চড়ুই

চড়ুইরা অন্য পাখীদের মতো খারাপ জিনিস খায় না। ঘাসের বীজ ও অন্য শস্যই ইহাদের প্রধান আহার। কিন্তু তাই বলিয়া সম্মুখে ছোটো পোকা-মাকড় পাইলে সেগুলিকে খাইতে ছাড়ে না। মাটি হইতে শস্য খুঁটিয়া খাইতে হয় বলিয়া ইহাদের ঠোঁটগুলি বেশ মোটা এবং শক্ত। ক্যানারি পাখীরা চড়ুইয়েরই জাতের। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা ক্যানারি থাকে, তবে তাহাদের ঠোঁট পরীক্ষা করিলে চড়ুইদের ঠোঁট কি রকম, তাহা বুঝিতে পারিবে।

চড়ুইদের স্নান তোমরা দেখিয়াছ কি? অন্য পাখীরা স্নান করে জল দিয়া, চড়ুইরা স্নান করে ধূলা দিয়া। দুই তিনটা চড়ুই কিছুক্ষণ ধূলাতে লুটাপুটি খাইয়া গা ঝাড়িয়া উড়িয়া গেল, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। বোধ করি, গায়ে পোকা হইলে উহারা ঐ রকমে ধূলা মাখে।

যাহা হউক, চড়ুই ছোটো পাখী হইলেও বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাসা বাঁধিবার সময়ে বড় জ্বালাতন করে। ইহারা

জঙ্গলের বা বাগানের গাছের ডালে বাসা বাঁধে না। দেশের খড়-কুটা ও শুক্না ঘাস ঠোঁটে লইয়া ঘরের কড়ি-কাঠের ফাঁকে বা কার্ণিশে জমা করে। কিন্তু যাহা কষ্ট করিয়া বহিয়া আনে, তাহার প্রায় সবই মাটিতে পড়িয়া যায়। তাই দিনে তিনবার করিয়া ঝাঁট্ না দিলে ঘর পরিষ্কার রাখা যায় না। যদি চুপ করিয়া এক মনে বাসা বাঁধে তাহা হইলে কোনো হাঙ্গামা থাকে না। কিন্তু চড়ুইদের প্রায়ই চুপ করিয়া থাকিতে দেখা যায় না। একগাছি খড় ঠোঁটে করিয়া আনিয়াই স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া ভয়ানক "চর্ চর্" শব্দ করিতে করিতে বাসার চারিদিকে লাফাইতে আরম্ভ করে। এত আনন্দ যে কেন হয়, তাহা বুঝাই যায় না। তার পরে একই ঘরে যদি দুই জোড়া চড়ুই বাসা করিতে লাগে, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হয়। দিনের মধ্যে দশ বার দুই দলে ঝগড়া বাধে।

চড়ুইরা হিংসুটেও কম নয়। যে ঘরে এক জোড়া চড়ুইয়ে বাসা করিয়াছে, সেখানে পায়রা, শালিক বা অন্য পাখী উঁকি মারিলেই চড়ুইরা ভয়ানক রাগিয়া যায়। তার পরে "চড়-চড় কড়-কড়" শব্দে লাফাইতে লাফাইতে এমন গালাগালি জুড়িয়া দেয় যে, সেখানে আর কোনো পাখীই আসে না। চড়ুইদের ডিমের রঙ্ কতকটা যেন ধূসর। ইহারা বড় অসাবধান পাখী, তাই বাসা হইতে ডিম মাটিতে পড়িয়া প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়।

অন্য পাখীদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করিলেও চড়ুইরা যে খুব বুদ্ধিমান্ পাখী ইহা বলা যায় না। আমাদের বাড়ীতে একটা বড় আয়না ছিল। এক জোড়া চড়ুই প্রতিদিন আয়নার সম্মুখে নিজেদের চেহারা দেখিত এবং নিজেদের ছবিকে অন্য চড়ুই ভাবিয়া আয়নায় ঠোকর দিত। এই রকমে ঠোকর মারায় ঠোঁট দিয়া রক্তপাত হইতেছে, ইহাও দেখিয়াছি। চড়ুইরা কি রকম বোকা, একবার ভাবিয়া দেখ।

তুতী পাখীদের বোধ করি তোমরা সকলে দেখ নাই। শীতকালে এই পাখীরা আমাদের দেশে বেড়াইতে আসে। চৈত্র মাস পড়িলেই অন্য দেশে চলিয়া যায়। তুত ফল খাইতে ভালবাসে বলিয়া লোকে ইহাদিগকে তুতী নাম দিয়াছে। ইহারা চড়ুই জাতিরই পাখী। পাখীগুলি দেখিতে কিন্তু অতি সুন্দর। ইহাদের পিঠের পালকের রঙ খয়েরি, কিন্তু বুক গলা ও মাথার রঙ্ গোলাপি। ইহা পুরুষ-পাখীর গায়ের রঙ্। স্ত্রী-পাখীদের পালকে কিন্তু এত রঙের বাহার দেখা যায় না। চড়ুইদের মতো ইহারা গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া বাসা বাঁধে না। সুতরাং তোমরা ইহাদিগকে সহজে দেখিতে পাইবে না। শীতকালে বাগানে বেড়াইবার সময়ে খোঁজ করিলে হয় ত দুই চারিটা নজরে পড়িবে।

খঞ্জন জাতি

খঞ্জন জাতির সব পাখী বারো মাস আমাদের দেশে থাকে না। শীত পড়িলেই ইহারা বাংলা মুলুকে চরিতে আসে। তার পরে গরম পড়িলেই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের আমরা খঞ্জন বলি, তাহারা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে। খঞ্জন জাতির পাখীদের উড়ার ভঙ্গী বড় মজার। তাহারা কাক বা শালিক প্রভৃতি পাখীদের মতো সোজাসুজি উড়িতে পারে না। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, যেন ঢেউয়ের গতিতে উঁচু-নীচু হইয়া উহারা উড়িয়া বেড়াইতেছে। তা ছাড়া লেজ-নাড়া তাহাদের একটা বদ্-অভ্যাস। আমাদের মধ্যে অনেকে যেমন চেয়ার বা বেঞ্চে বসিয়া ক্রমাগত পা নাড়ায়, খঞ্জন জাতির পাখীরা সেই রকম অবিরাম লেজ নাড়ায়। এই জন্য ইংরাজিতে ইহাদের লেজ-নাড়া পাখী বলে এবং হিন্দুস্থানীরা বলে "ধোবিন্"। ধোবারা যেমন কাপড় আছড়ায়, এই পাখীরা সেই রকমে লেজগুলাকে উঁচু নীচু করিয়া নাচায় বলিয়া তাহাদের ঐ নাম হইয়াছে। খঞ্জন জাতির পাখীদের আমরা ফলমূল খাইতে দেখি নাই। বোধ করি ইহারা ফলমূল খায় না, তাই প্রায়ই গাছের ডালে বসে না। পোকামাকড়ই ইহাদের প্রিয় খাদ্য। এই জন্য মাঠে মাটির

খঞ্জন

উপরে লেজ নাড়িতে নাড়িতে ইহারা চরিয়া বেড়ায়,—তাড়া দিলে "কিচ্" করিয়া ডাকিয়া উড়িয়া যায়। এই সব লক্ষণ দেখিয়া তোমরা বোধ করি খঞ্জন জাতির পাখীদের চিনিয়া লইতে পারিবে।

আমরা যাহাদের খঞ্জন বলি, সেগুলি লেজ-নাড়া "ধোবিন্" পাখীদের চেয়ে আকারে বড়। ইহাদের বুক ও শরীরের নীচেকার পালকের রঙ্ সাদা। ডানায় একটা করিয়া মোটা সাদা ডোরা আছে। লেজের পালকেব রঙ্ এবং ভ্রূর রঙ্ সুন্দর সাদা।

খঞ্জনেরা গাছের উপরে বাসা বাঁধে না। বাড়ীর নালার ভিতরে বা ফাটালে ইহাদিগকে বাসা করিতে দেখিয়াছি। এই বাসার উপরেই তাহারা ফিকে সবুজ রঙের ডিম পাড়ে।

খঞ্জনদের গলার স্বর বড় মিষ্ট। কিন্তু সকল সময়ে ইহারা গান গায় না। পোকা খাইয়া পেট ভরিয়া গেলে খঞ্জনদের গানের সখ্ চাপে। তখন টেলিগ্রাফের তাবের উপরে বা কোনো নিরিবিলি জায়গায় বসিয়া গান জুড়িয়া দেয়।

দোয়েল

ছোটো পাখীদের মধ্যে দোয়েলদের দেখিতে যেমন সুন্দর, বোধ করি কোনো পাখী সে রকম নয়। গায়ে কতকগুলা রঙীন পালক থাকিলেই পাখীরা সুন্দর হয় না। চাল-চলন, উড়িবার ভঙ্গী পাখীদের সুন্দর করে। দোয়েলের সবই সুন্দর। ইহাদের গলার স্বর সুন্দর, গায়ের সাদা ও কালো পালক-গুলা সুন্দর এবং চাল-চালনও সুন্দর।

পুরুষ-দোয়েল ও স্ত্রী-দোয়েলদের চেহারায় অনেক তফাৎ আছে। ইহা তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? পুরুষ-দোয়েলের গায়ের রঙ্ চক্‌চকে কালো কিন্তু তলপেটের পালকের রঙ্ সাদা। আবার লেজের পালকও সাদা। স্ত্রী-দোয়েলের গায়ে ঠিক্ কালো পালক দেখা যায় না। কালোর বদলে কতকটা ধূসর রঙের পালক থাকে। কিন্তু ইহারা নিতান্ত অকর্ম্মা। পুরুষ-দোয়েলের মতো ইহাদের গলার স্বর মিষ্ট নয়, তা ছাড়া সে-রকম চট্‌পটেও নয়।

বাগানে খোঁজ করিলেই হয় ত তোমরা দুই-এক জোড়া দোয়েল দেখিতে পাইবে। দোয়েলরা ভারতবর্ষেরই পাখী। হিমালয়ের খুব শীতের জায়গাতেও দোয়েল দেখা যায়।

দোয়েলের সঙ্গে খঞ্জনের রঙের মিল দেখিয়া অনেকে খঞ্জনকে দোয়েল মনে করে। তোমরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, খঞ্জনেরা যেমন লেজ নাচাইয়া বেড়ায়, দোয়েলরা তাহা করে না। ইহাদের লেজ সর্ব্বদা খাড়া থাকে, তা ছাড়া খঞ্জনদের মতো ইহাদের সাদা ভ্রূও নাই। আমরা দোয়েলদের এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে দেখি নাই। কখনো গাছের ডালে, কখনো মাটিতে, কখনো বা ঝোপ-জঙ্গলের উপরে অবিরাম লাফাইয়া চলে। পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান খাদ্য। বোধ হয়, পোকা ধরিবার জন্যই উহাদের এত লাফালাফি।

দোয়েল

তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, ডিম পাড়িবার ও বাসা বাঁধিবার সময়েই অধিকাংশ গায়ক পাখীর গলা খুলিয়া যায়। কোকিলরা সমস্ত বৎসর চুপ করিয়া থাকিয়া বসন্ত কালে ডিম পাড়িবার সময় আসিলে গলা ছাড়িয়া গান সুরু করে। পুরুষ-কোকিলে গান করে, আর স্ত্রী-কোকিল শীঘ্র ডিম পাড়িবে বলিয়া আনন্দ করে। পাপিয়ারাও সমস্ত বৎসর মুখ বুজিয়া থাকিয়া ফাল্গুন মাসে গলা ছাড়িয়া গান গাইতে থাকে। দোয়েলদের মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। শীতকালে তাহারা প্রায়ই গান গায় না,—যেই বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে ডিম পাড়া ও বাসা বাঁধার তাগিদ আসে, অমনি তাহাদের গলা খুলিয়া যায়। তাহাদের

উড়ার ভঙ্গী, গানের তান দেখিলে শুনিলে মনে হয়, যেন পাখীগুলি আনন্দে ভরপূর হইয়া আছে। আনন্দ হইলে তোমরা যেমন অনাবশ্যক ঘুরপাক্ দাও, চীৎকার কর, ইহারাও যেন তাহাই করে।

দোয়েলরা কাক-শালিকদের মতো গাছের ডালে বাসা বাঁধে না। ইহারা গাছের কোটরে, দেওয়ালের ফাটালে, বা নালার মুখে খড়-কুটা বিছাইয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলির রঙ ফিকে সবুজ, কিন্তু তাহারি উপরে আবার খয়েরি রঙের পোঁচ থাকে।

তোমরা শ্যামা পাখীর নাম বোধ করি শুনিয়াছ। কলিকাতার বাজারে শ্যামা পাখী বিক্রয় হয়, লোকে সখ্ করিয়া ইহাদের খাঁচায় রাখিয়া পোষে। ইহাদের গান বড় সুমিষ্ট। শ্যামারা দোয়েল জাতিরই পাখী। কিন্তু ইহারা গ্রামের কাছে বাসা করে না; বনে-জঙ্গলে আনন্দে বেড়ায় ও গান করে। লোকে সেখান হইতে ইহাদের ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পোষে।

ফিঙে

ফিঙে পাখীদের তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। পূর্ব্ববঙ্গের এই পাখীকে চলিত কথায় "ফেচো" বলিয়াও ডাকে। মিশ্‌মিশে কালো পালকে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকে। লেজও কালো। লেজের পালক খুব লম্বা। এই লম্বা লেজ লইয়া ফিঙেদের সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। গল্পে শুনিয়াছি, আমাদের দেশের প্রাচীনকালের রাজারা লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। কোঁচা এত লম্বা থাকিত যে, তাহা মাটিতে লুটাইয়া চলিত। তাই এক-একজন খানসামা রাজাদের কোঁচা ধরিয়া হেঁট হইয়া চলিত। আজো য়ুরোপের রাজা-রাজড়াদের পোষাক পাছে মাটিতে লুটায়, তাই পোষাকের আগা চাকরেরা ধরিয়া চলে। ফিঙের লেজ কতকটা যেন লম্বা পোষাকের মতো মাটিতে ঠেকে। কিন্তু ফিঙেদের ত আর চাকর-বাকর নাই যে লেজটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। তাই উহারা মনের দুঃখে মাটিতে চরিতে নামে না,—নামিলেই লেজ মাটিতে লুটাইয়া চলে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে, ফিঙেরা প্রায়ই টেলিগ্রাফের তারের উপরে বা গাছের খুব উঁচু জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহা দেখিলে মনে হয়,

ফিঙে

ফিঙেরা বুঝি খুব অহঙ্কারী পাখী, তাই মাটিতে পা দেয় না। কিন্তু তাহা নয়। দুই-একটা লোক যেমন মাথার চুলের খুব যত্ন করে,—দিনের মধ্যে দশ বার আয়না-চিরুণি লইয়া টেরি কাটে, সেই রকম পাখীদের মধ্যে ফিঙেরা লেজের খুব যত্ন করে। তাই পাছে মাটিতে ঠেকিয়া লেজ খারাপ হইয়া যায়, এই ভয়ে তাহারা মাটিতে পা দেয় না।

পোকা-মাকড়ই ফিঙেদের প্রধান আহার। মাটিতে চরিয়া বেড়াইবার সুবিধা নাই বলিয়া তাহারা উড়িতে উড়িতেই পোকা ধরিয়া খায়। যখন ফিঙেরা টেলিগ্রাফের তারের উপরে বা বাঁশের উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন হয় ত তোমরা মনে কর, ফিঙেরা হাওয়া খাইতেছে। কিন্তু তাহা নয়। কোথায় পোকা উড়িয়া বেড়াইতেছে সে-সময়ে কেবল ইহারা তাহাই দেখে। পোকা নজরে পড়িলেই ছোঁ মারিয়া ধরিয়া খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে সন্ধ্যার সময়ে অনেক পোকা বাহির হয়। তাই সূর্য্য অস্ত গেলে যখন অন্য পাখীরা বাসায় ফিরে, তখন ফিঙেদের শিকার করিবার সময় হয়। তোমরা একটু খোঁজ করিলেই দেখিবে, সন্ধ্যার সময়ে যখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তখনো তোমাদের বাগানে ফিঙেরা উড়িয়া উড়িয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। ভয় পাইলে বা কোনো পাখীকে তাড়াইতে গেলে ফিঙেরা যে শব্দ করে, তাহা শুনিতে ভাল নয়। অন্য সময়ে যখন আপন মনে ডাকে, তখন তাহার স্বর বড় মিষ্ট বোধ হয়।

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ রাত্রিতে ফিঙেরা বাসায় থাকিয়া যে শব্দ করে, তাহা বড় সুন্দর। বোধ করি, কালোয়াত্‌দের মতো উহারা সে-সময়ে গান অভ্যাস করে। তখন রাত্রি তুইটা বাজিলেই উহাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়। তার পরে কাছাকাছি যত ফিঙে থাকে, তাহাদের মধ্যে গানের পাল্লা লাগিয়া যায়। একটা পাখী এক গাছ হইতে গান সুরু করে, অন্য গাছের আর একটা পাখী গান গাহিয়া তাহার উত্তর দেয়। এই রকমে বাগান যেন ফিঙেদের গানের আসর হইয়া দাঁড়ায়। বিছানায় শুইয়া এই গানের পাল্লা শুনিতে বেশ ভাল লাগে। তোমরা ইহা শুন নাই কি?

ফিঙেরা যখন গাছের আগায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহাদের খুব শান্ত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু তাহারা মোটেই শান্ত নয়। এমন তুষ্ট ও ঝগ্‌ড়াটে পাখী বোধ করি তুনিয়াতে খুঁজিয়া মেলে না। তুষ্টামিতে ইহারা কখনো কখনো কাকদেরও হারাইয়া দেয়। ফিঙেদের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। শুক্‌না ঘাস ও শুক্‌না ঘাসের শিকড় এই রকম নানা জিনিস দিয়া

ফিঙে

ইহারা পেয়ালার আকারে ছোটো বাসা বানায়। পাছে বাসার ঘাসগুলি এলোমেলো হইয়া খসিয়া পড়ে, এই জন্য ইহারা মাকড়সার জাল ঠোঁটে করিয়া আনিয়া বাসার খড়-কুটায় জড়াইয়া রাখে। ফিঙেদের লেজ কত লম্বা, তাহা তোমরা

দেখিয়াছ। এই লেজের জায়গা বাসায় হয় না। তাই যখন তাহারা ডিমে তা দিতে বসে, তখন লেজ বাসার বাহিরে থাকিয়া যায়।

ফিঙেরা এমন ঝগড়াটে যে, কাক কোকিল চিল শিকরা সকলেরি সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। বাছুর হইলে ছুই-একটা গরু কি রকম দুষ্ট হয়, তাহা হয় ত দেখিয়াছ। তখন সে মানুষ দেখিলেই ফোঁস-ফোঁস করিয়া শিং নাড়াইয়া মারিতে যায়; বোধ হয় ভাবে, পৃথিবীর সকলেই তাহার বাছুরটিকে কাড়িবার জন্য ফন্দি করিতেছে। ডিম পাড়া হইলে ফিঙেদের মেজাজ ঠিক্ ঐ রকমই হয়। তখন কোনো পাখীই উহাদের বাসার কাছে ঘেঁসিতে পারে না। যদি কোনো পাখী ভুল করিয়া বাসার কাছে ডালে গিয়া বসে, তবে ফিঙেরা তাহাকে ঠোক্‌রাইয়া তাড়াইয়া দেয়। তখন এমন কি, কুকুর-বিড়ালেরও গাছতলা দিয়া যাইবার হুকুম থাকে না,—গেলে ফিঙেদের ঠোকর খাইতে হয়। আমরা একবার ফিঙের বাসার তলা দিয়া যাইবার সময়ে ভয়ানক ঠোকর খাইয়াছিলাম,—তাহা আজও মনে আছে। সেই অবধি দূরে দাঁড়াইয়া ফিঙেদের বাসা পরীক্ষা করি। ফিঙেরা কাকদের দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। কাক যদি একবার ফিঙের বাসায় উঁকি দেয়, তবে আর রক্ষা থাকে না। ফিঙেরা কাকের পিছনে ছুটিয়া তাহাকে ঠোক্‌রাইয়া গ্রাম ছাড়া করে। ফিঙে ও কাকের এই যুদ্ধ ডিম-পাড়ার সময়ে

প্রায়ই দেখা যায়। ফিঙেরা যে কেবল পাখীদেরই বিরক্ত করে, তাহা নয়। মাঠে গরু চরিতেছে, হঠাৎ কোথা হইতে একটা ফিঙে আসিয়া তাহার ঘাড়ে চড়িল এবং একটু আরাম করিয়া উড়িয়া গেল, ইহাও আমরা অনেক দেখিযাছি। গরুগুলা নিতান্ত বোকা, তাই ফিঙেদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায় না। যাহা হউক, ফিঙেরা গৃহস্থের বাড়ীতে চরিতে আসে না। তাহা না হইলে এই পাখীদের জ্বালায় গৃহস্থদেরও অস্থির হইতে হইত।

যাহা হউক, পাখীদের মধ্যে সকলেরি সহিত যে ফিঙেদের ঝগড়া, একথা বলা যায় না। ঘুঘু ও হল্‌দে পাখীদের সঙ্গে, ফিঙেদের বড় ভাব। তাই যে-গাছে ফিঙেরা বাসা বাঁধে সেখানে খোঁজ করিলে প্রায়ই ঘুঘু ও হল্‌দে পাখীদের বাসা দেখা যায়। দারোগার বাড়ীর কাছে গৃহস্থের বাড়ী থাকিলে গৃহস্থের আর চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না। সত্যই ফিঙেরা পুলিস-দারোগার মতো জবরদস্ত্‌ পাখী। তাই হল্‌দে ও ঘুঘু পাখীরা তাহাদের আশ্রয়ে বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। হিন্দুস্থানীতে ফিঙে পাখীকে কি বলা হয় তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। ফিঙের হিন্দুস্থানী নাম—কোতায়াল অর্থাৎ দারোগা পাখী। দারোগার কাছে চোর-ডাকাত যেমন জব্দ থাকে, ফিঙেদের কাছে অন্য পাখীদিগকে ঠিক্ সেই রকমেই শিষ্ট-শান্ত থাকিতে দেখা যায়।

এই সাধারণ ফিঙে ছাড়া আমাদের দেশে "বাচাঙ্গা" নামে

আর এক রকম ফিঙে দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট্ চেপ্টা, পেটের তলা সাদা। অন্য পালকের রঙ্ কালো। কিন্তু আকারে ইহারা সাধারণ ফিঙেদের তুলনায় কিছু ছোটো হয়। এই পাখীদের সর্ব্বদা দেখা যায় না।

ছাতারে

ছাতারে পাখী বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহাদের ডানা ছোটো। তাই উঁচু গাছে উঠিতে পারে না,—উড়িয়া যে দশ হাত দূরে গিয়া বসিবে, তাহাও পারে না। পাখীদের মধ্যে যাহাদের ডানার জোর থাকে না, তাহাদের পায়ের জোর বেশি দেখা যায়। ছাতারে পাখীদের পায়ের জোর খুব বেশি,—তাড়া করিলে কতকটা উড়িয়া কতকটা দৌড়াইয়া তাহাদিগকে পালাইতে দেখা যায়। শালিক ও বকেরা যেমন আমাদের মতো একে একে পা ফেলিয়া চলে, ছাতারেরা সে-রকমে চলিতে পারে না। জোড়া পায়ে লাফাইয়া চলাই ইহাদের স্বভাব।

ছাতারে

কোন্ পাখীদের আমরা ছাতারে বলিতেছি, তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ কি? ইহাদিগকে কেহ কেহ "সাত ভাই" পাখীও বলে। ইহারা পাঁচ-সাতটায় মিলিয়া ভয়ানক "কেঁচর-কেঁচর" শব্দ করিতে করিতে আতা নেবু প্রভৃতি

ছোটো গাছের তলায় বেড়ায়। এই রকমে এক সঙ্গে অনেক-গুলি করিয়া চরিয়া বেড়ায় বলিয়াই বোধ হয় ছাতারেদের "সাত ভাই" নাম দেওয়া হয়। যাহাই বল, এই পাখীদের দেখিতে কিন্তু ভারি বিশ্রী। আকারে ইহারা শালিকের চেয়ে বোধ করি বেশি বড় হয় না। গায়ের রঙ্ মাটির মতো, চোখ, পা, ঠোঁট সবই সাদা,—দেখিলেই মনে হয় যেন সন্থ অসুখে ভুগিয়া উঠিয়াছে, তাই গায়ে রক্ত নাই। কিন্তু চোখের চাহুনি দেখিলেই বুঝা যায়, পাখীগুলা ভয়ানক দুষ্ট। খুব দুষ্ট ছেলের তাকানি কি রকম তোমরা দেখ নাই কি? ছাতারেদের চাহুনি যেন কতকটা সেই রকমের।

ছাতারে পাখীদের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। গাছের খুব উপর ডালে ইহারা উঠিতে পারে না। তাই ঝোপ-জঙ্গলের ছোটো গাছের পাতার আড়ালে বাসা বাঁধিয়া ইহারা ডিম পাড়ে। আমরা ছাতারের বাসা দেখিয়াছি,—ঘাস ও খড় দিয়া উহারা বাসাগুলিকে পেয়ালার আকারে তৈয়ারি করে। কিন্তু সেগুলিকে ভালো করিয়া বাসায় সাজাইয়া রাখিতে পারে না। তাই দূর হইতে ছাতারের বাসাকে খড়কুটার ঢিপি বলিয়া মনে হয়। বাসায় খড়কুটা এমন এলোমেলো করিয়া সাজানো থাকে যে, প্রায়ই উহাদের দুই-একটা ডিম বাসার ফাঁক দিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

কোকিলেরা যেমন লুকাইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তেমনি ছাতারের বাসায় পাপিয়ারা ডিম পাড়ে। কিন্তু

ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই। পাপিয়ার ডিম ছাতারের ডিমের মতো উজ্জ্বল নীল রঙের কিন্তু আকারে একটু বড়। তাই পাপিয়ারা সুবিধা মত ছাতারের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসিলে ছাতারেরা সেগুলিকে নিজের ডিম মনে করিয়া তা দিয়া ডিম ফোটায়। ছাতারের বাচ্চা এবং পাপিয়ার বাচ্চা দেখিতে প্রায় ঠিক এক রকমেরই। তাই ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইলেও কোন্‌টি নিজের বাচ্চা এবং কোন্‌টিই বা পরের বাচ্চা, তাহা ছাতারেরা বুঝিতে পারে না। কিন্তু পাপিয়াদের ছানারা ভয়ানক রাক্ষুসে,—দিবারাত্রিই কোকিল ও কাকের বাচ্চাদের মতো খাই-খাই করে। তাই পরের ছানাদের পেট ভরাইতে ছাতারেদের সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

"ফটিক জল" পাখী তোমরা কখনো দেখিয়াছ কিনা জানি না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহাদের ডাক কিন্তু প্রায়ই শুনা যায়। তখন বট গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসিয়া ইহারা শিষ্‌ দিয়া "ফ——টি—ই—ই—ই—ক্‌ জল" এই রকম শব্দ করে। দুপুর বেলায় ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যে যখন সব নিস্তব্ধ, তখন এই ডাক শুনিতে বেশ মিষ্ট লাগে। সত্যই মনে হয়, পাখীগুলা বুঝি তৃষ্ণায় আকুল হইয়া "ফটিক জল "ফটিক জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। লোকে বলে, ইহারা কাক-শালিকদের মতো জলাশয়ের জল খায় না। যখন বৃষ্টির জল পড়ে, তখন হাঁ করিয়া জলের বিন্দু খাইয়া তৃষ্ণা থামায়। তোমরা বোধ করি ভাবিতেছ, এই পাখীদেরই

বুঝি চাতক বলে। কিন্তু তাহা নয়, চাতক পাখী অন্য রকমের।

যাহা হউক, "ফটিক জল" পাখীরা ছাতারে জাতিরই পাখী। ইহারা আকারে চড়ুইদের চেয়েও ছোটো; কিন্তু গায়ে সবুজ রঙের পালক থাকে।

বুল্‌বুল্‌

তোমরা কত রকমের বুল্‌বুল্‌ পাখী দেখিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু আমাদের বাগানে কালো বুল্‌বুল্‌ এবং সিপাহী বুল্‌বুল্‌ এই দুই রকম দেখিয়াছি।

কালো বুল্‌বুল্‌দের ঝুঁটি ও ডানা কালো। লেজও কালো; কেবল তাহার শেষের কয়েকটা পালকের আগা সাদা। লেজের তলাটা আবার সুন্দর লাল। কিন্তু ঝুঁটি ও মাথা যত কালো, শরীরটা তত ঘন কালো নয়।

বাগানে খোঁজ করিলে তোমরা বুল্‌বুল্‌দের জোড়া জোড়া বেড়াইতে দেখিবে। পাকা ফল এবং ফুলের কুঁড়ি ইহাদের প্রিয় খাদ্য। পাকা তেলাকুচা ইহারা বড় ভালবাসে। আমরা একবার একটি বুল্‌বুল্‌ পুষিয়াছিলাম। ফলের মধ্যে সে পাকা তেলাকুচা পাইলে আর কিছুই খাইতে চাহিত না। ফড়িং ও অন্য পোকা আনিয়া দিলেও সে খাইত।

বুল্‌বুল্‌দের বাসা তোমরা বোধ করি দেখ নাই। ইহাদের বাসার সন্ধান করিবার জন্য তোমাদের বেশী কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। হয় ত তোমাদের বাগানের বেড়ার উপরেই দুই একটা বুল্‌বুলের বাসা দেখিতে পাইবে। উঁচু গাছের উপরে ইহারা কখনই বাসা বাঁধে না। বাসা-গুলি দেখিতে ছোটো ছোটো পেয়ালার মতো। বুল্‌বুল্‌রা

খড়কুটা দিয়া বাসাগুলি তৈয়ারি করে। এই বাসার উপরেই ইহারা গোলাপির উপরে লালের দাগ দেওয়া কয়েকটা ডিম পাড়ে। অত বড় লেজ লইয়া বাসায় বসিতে জায়গা হয় না। তাই ডিমে তা দিবার সময়ে বুল্‌বুল্‌রা লেজ উঁচু করিয়া বাসায় বসে, তখন তাহাদের মুখগুলি থাকে বাসার বাহিরে। ডিম হইতে অতি অল্পই বাচ্চা হয়। নীচু ঝোপে বাসা থাকে বলিয়া বেজি, সাপ ও গিরিগিটিরা প্রায়ই ডিমগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। গৃহস্থের বাড়ীর কাছে বুল্‌বুল্‌রা যে-সব বাসা করে, সেখানকার ডিম বিড়ালে চুরি করিয়া খাইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই রকমে বার বার ডিম নষ্ট হইলে তাহারা কিন্তু একটুও হতাশ হয় না—আবার নূতন করিয়া ডিম পাড়ে। প্রতি বৎসরে একই বুল্‌বুলে তিন-চারি বার ডিম পাড়িতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়।

বুল্‌বুল

বোধ করি, ডিম বেশী নষ্ট হয় বলিয়াই, ইহারা ডিম পাড়ে বেশী। বুল্‌বুল্‌দের পুরুষ স্ত্রী দুইয়ে মিলিয়া ডিমে তা দেয় ও বাচ্চাদের যত্ন করে। পুরুষ বুল্‌বুল্‌ ঠোঁটে করিয়া ফড়িং ও পোকা-মাকড় ধরিয়া আনিয়া বাচ্চাদের খাওয়াইতেছে, ইহা তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে।

সিপাহী বুল্‌বুল্‌দের চেহারা বড় সুন্দর। ইহাদের পেটের তলার রঙ্‌ সাদা। মাথার ঝুঁটি মিশ্‌মিশে কালো। ডানার

পালকের রঙ্ খয়েরি। তার পরে আবার মাথার দুই পাশের পালকের রঙ্ সুন্দর লাল। সিপাহীদের মাথায় যেমন লাল পাগ্‌ড়ি থাকে, ইহাদের মাথায় সেই রকম লাল পালক থাকে বলিয়াই এই পাখীদের সিপাহী বুল্‌বুল্ নাম দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ কালো বুল্‌বুল্‌দের মতো সিপাহী বুল্‌বুল্‌দের সদা-সর্ব্বদা দেখা যায় না। একটু নজর রাখিলে তোমরা তোমাদের বাগানেই ইহাদিগকে কোনো সময়ে দেখিতে পাইবে।

যাহা হউক, বুল্‌বুল্‌দের গলার স্বর মিষ্ট। এই জন্য লোকে এই পাখীদের ধরিয়া খাঁচায় রাখে। আগে আমাদের দেশের রাজা-বাদশাহরা বাঘের লড়াই ও হাতীর লড়াই দেখিতেন। কিছু দিন আগেও আমাদের দেশে বুল্‌বুলের লড়াই হইত। লোকে সখ করিয়া বুল্‌বুল্ পুষিত। তার পরে দুইটা বুল্‌বুল্‌কে ছাড়িয়া দিলেই, তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া ঠোক্‌রাঠুক্‌রি সুরু করিত। লোকে নাকি ইহা দেখিয়া খুব আমোদ পাইত।

"হরবোলা" পাখীর হয় ত তোমরা নাম শুনিয়াছ। এই পাখীরা নাকি অন্য পাখীদের গলার স্বর নকল করিতে পারে। এই জন্যই ইহাদের নাম হরবোলা। এই পাখীরা বুল্‌বুল্‌দেরই জাত-ভাই। ইহাদের লেজ ছোটো, ঠোঁট্ সরু এবং কতকটা বাঁকা। গলার রঙ্ নাকি নীল। "হরবোলা"দের বাংলা দেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

হল্‌দে পাখী

হল্‌দে পাখীদের যে কত রকম নাম আছে, তাহা বলিয়াই শেষ করা যায় না। ইহাদের কেহ "বেনে বউ," কেহ "কৃষ্ণ গোকুল," কেহ বা "ইষ্টি কুটুম" পাখী বলিয়া ডাকে। ইহাদের চেহারা যেমন সুন্দর, গলার স্বরও তেমনি মিষ্ট। আবার ইহাদের গলা হইতে নানা রকম স্বর বাহির হয়। এক এক সময়ে ইহারা ঠিক্ যেন "খোকা হোক" এই রকম শব্দ করে। তাই হল্‌দে পাখীদের কেহ কেহ "খোকা হোক" পাখীও বলে।

তোমরা হল্‌দে পাখী হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের গা ও ডানার পালকের রঙ্ উজ্জ্বল হল্‌দে। কিন্তু মাথা বুক ও গলার কিছুদূর পর্য্যন্ত মিশ্‌মিশে কালো। ঠোঁট্ ও চোখের রঙ্ আবার লাল। এই রকম হলুদ ও লালে মিলিয়া পাখী-গুলিকে বড় সুন্দর দেখায়।

হল্‌দে পাখীরা শালিক ও কাকদের মতো কখনই মাটিতে নামিয়া চরিয়া বেড়ায় না। ইহারা ভয়ানক লাজুক। গাছের পাতার আড়ালে বসিয়া আপন মনে ডাকিতে থাকে এবং মানুষের পায়ের শব্দ পাইলেই এক গাছ হইতে অন্য গাছে চলিয়া যায়।

যাহা হউক, হল্‌দে পাখীদের চেহারা যেমন সুন্দর, তাহাদের বাসাগুলিও তেমনি সুন্দর। নেয়ারের খাট তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। চওড়া ফিতা দিয়া এই খাট ছাওয়া হয়। তাই ইহাতে শুইতে বেশ আরাম লাগে। হল্‌দে পাখীরা তুত্‌ প্রভৃতি গাছের চওড়া ছাল আনিয়া গাছের দুই ডালে আট্‌কাইয়া তাহার উপরে বাসা বানায়। তাই, বাসাগুলিকে এক-একটা ছোটো নেয়ারের খাট বা দোল্‌নার মতো দেখায়। বোধ করি, এই রকম বাসায় থাকিয়া হল্‌দে পাখীরা বেশ আরাম পায়। এই সব বাসায় একটুও আবর্জ্জনা থাকে না। ইহারা শুক্‌না ঘাস ও শিকড় কুড়াইয়া আনিয়া বাসাগুলিতে এমন সুন্দর-ভাবে সাজাইয়া রাখে যে, দেখিলেই যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। হল্‌দে পাখীরা ফিঙেদের মতোই পেয়ালার আকারে বাসা বানায়। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখীই বাসা বাঁধিবার সময়ে ভয়ানক পরিশ্রম করে, কিন্তু ডিমে তা দেয় কেবল স্ত্রী-পাখীরা। তোমরা সুবিধা পাইলে হল্‌দে পাখীদের বাসা খোঁজ করিয়া পরীক্ষা করিয়ো। তোমাদের আগেই বলিয়াছি, ফিঙেরা যে-গাছে বাসা করে, হল্‌দে পাখীরা প্রায়ই সেই গাছে বাসা বাঁধে। তাই ফিঙেরা কোথায় বাসা বাঁধিয়াছে তাহার সন্ধান করিতে পারিলে, তোমরা হয় ত দুই একটা হল্‌দে পাখীর বাসারও সন্ধান পাইবে।

কোকিল

কোকিলের ডাক তোমরা অনেকে শুনিয়াছ। ইহাদের চেহারা ভালো করিয়া দেখিয়াছ কিনা জানি না। কোকিলের স্ত্রী ও পুরুষদের চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরুষ-কোকিলের গায়ের সব পালকের রঙ্ চক্‌চকে কালো। চোখ দু'টি আবার সুন্দর লাল। কিন্তু ঠোঁটের রঙ্ যেন কতকটা সবুজ রকমের। ইহারাই ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত "কু—উ, কু—উ" করিয়া ডাকে। ইহাদের গলার স্বর অতি মিষ্ট। কিন্তু বারো মাস এই রকম স্বরে ডাকিতে পারে না। আষাঢ় মাস হইতে কেবল "কুহু কুহু কুক্ কুক্" শব্দ ছাড়া অন্য স্বর তাহাদের গলা হইতে বাহির হয় না। খুব ভোর বেলায় যখন কোকিলরা এই রকমে ঝঙ্কার দেয়, তখন কিন্তু সেই শব্দ বেশ ভালই লাগে।

কোকিল

স্ত্রী-কোকিলদের গায়ের রঙ্ কতকটা খয়েরি। তাহারি উপরে আবার সাদা ডোরা ও ছিটা-ফোঁটা থাকে। লোকে

ইহাদের তিলে-কোকিল বলে। আমরা ছেলে-বেলায় ভাবিতাম, তিলে-কোকিলরা পৃথক্ জাতের কোকিল। কিন্তু তাহা নয়,—ইহারাই স্ত্রী-কোকিল। স্ত্রী-কোকিলরা "কু-উ কু—উ" করিয়া ডাকিতে পারে না। ইহাদের গলার স্বর কি রকম যেন ভাঙা-ভাঙা, বিশ্রী। লোকে বলে. কোকিলরা বর্ষাকালে আমাদের দেশ ছাড়িয়া পালায় এবং তার পরে ফাল্গুন মাসে আবার এদেশে আসে। বোধ করি, কোকিলদের সেই "কু—উ, কু—উ" মিষ্ট ডাক শুনিতে না পাইয়া লোকে ঐ কথা বলে। কিন্তু উহা ঠিক কথা নয়। কোকিলরা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে। আষাঢ় মাস পড়িলেই তাহাদের গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহাদের স্ফূর্ত্তিও কমিয়া যায়, তাই সেই ভোর রাত্রির ঝঙ্কার ছাড়া তাহাদের আর সাড়া-শব্দই পাওয়া যায় না। এই কয়েকটা মাস তাহারা গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া অশথ বট প্রভৃতির ফল ও পোকা-মাকড় খাইয়াই কাটায়। তার পরে ফাল্গুন মাসে যেই দক্ষিণে বাতাস গায়ে লাগে, অমনি তাহাদের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া যায়; তখন গলা ছাড়িয়া ডাকিতে আরম্ভ করে।

যাহা হউক, কোকিলরা বড় লক্ষ্মী-ছাড়া পাখী। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে যখন অধিকাংশ পাখীই ডিম পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া খড়কুটা কুড়াইয়া দিন কাটায়—তখন কোকিলরা কেবল গানেই মত্ত থাকে,—ঘর-সংসারের দিকে একটুও

তাকায় না। কোকিলের বাসা তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারা জন্মেও বাসা বাঁধে না। বোধ করি, বাসা বাঁধিতে জানেও না। চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসে কত পাখী কত রকমের বাসা বাঁধে। কিন্তু খড়-কুটা মুখে করিয়া তোমরা কখনো কোকিলদের উড়িতে দেখিয়াছ কি? কোকিলরা লুকাইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। তাই বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া, ছানাদের যত্ন করা প্রভৃতি কাজ কি রকমে করিতে হয়, তাহারা জানেই না। কাকেরা নিজেদের ডিম মনে করিয়া কোকিলের ডিমে খুব যত্ন করিয়া তা দেয় এবং ডিম ফুটিলে ছানাদের যত্ন করিয়া পালন করে। তাহারা যে পরের বাচ্চা পালন করিতেছে, তাহা একেবারে বুঝিতেই পারে না। তার পরে হঠাৎ একদিন যখন সেগুলিকে কোকিলের বাচ্চা বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহাদিগকে দূর-দূর করিয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে কোকিলের বাচ্চাদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তখন তাহারা উড়িয়া নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করিয়া সুখে বেড়াইতে পারে। দেখ, কোকিলের বাচ্চাদের কত দুঃখ। জন্মে তাহারা বাপ-মায়ের আদর পায় না। পরের ঘরে জন্মিয়া পরের দয়ার উপরে নির্ভর করিয়া তাহাদের বড় হইতে হয়। তার পরে হঠাৎ একদিন সেই পরের ঘরও ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইতে হয়। কাকেরা এত চালাক পাখী হইয়া এইখানে কোকিলদের কাছে হার মানে। তাই বোধ করি,

কাক ও কোকিলের মধ্যে এত শত্রুতা। কেহ কাহাকেও দেখিতে পারে না,—যেন দা-কুমড়ার সম্পর্ক।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, যখন কাকেরা বাসায় থাকে না, তখন স্ত্রী-কোকিল লুকাইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। কিন্তু তাহা নয়, যে-রকম ফন্দি করিয়া কোকিলরা কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তাহা বড় মজার। আমরা আগেই বলিয়াছি, কালো কোকিলরাই পুরুষ এবং তিলে কোকিলরা স্ত্রী। স্ত্রী-কোকিলরা বড় লাজুক। যখন পুরুষ-কোকিলরা সেই টানা টানা সুরে গান জুড়িয়া আনন্দ করে, তখন স্ত্রী-কোকিলরা গাছের পাতার আড়ালে লুকাইয়া দিন কাটায়। যাহা হউক, ডিম পাড়ার সময় হইলে স্ত্রী-কোকিলকে পাতার আড়ালে বসাইয়া পুরুষ-কোকিল কাকের বাসার কাছে ডালে বসিয়া "কু—উ— কু—উ" করিয়া গান জুড়িয়া দেয়। কাকেরা কি রকম অদ্ভুত পাখী, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। সব ব্যাপারেই তাহাদের সন্দেহ। পৃথিবীতে যে ভালো বলিয়া কোনো জিনিস আছে, তাহা উহারা মানিতেই চায় না। "ধপাস্" করিয়া একটি শব্দ হইলে, দুজনে দৌড়াইয়া চলিলে, বা একটু উঁচু গলায় কথাবার্ত্তা কহিলে, এই লক্ষ্মীছাড়া পাখীদের মনে সন্দেহ হয়, আর "কা—কা" করিয়া আরো গোটা দশেক জাত-ভাইদের ডাকিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়। তার পরে পাখীদের মিষ্ট গানে বা ভালো শব্দে তাদের গায়ে ঝাঁটার বাড়ি মারে,

তাই নিজেদের বাসার কাছেই কোকিলকে গান গাহিতে শুনিয়া তাহারা আর স্থির থাকিতে পারে না—বাসার বাহিরে আসিয়াই "কা—কা" করিয়া কোকিলকে তাড়া করে। কিন্তু কোকিল চালাক পাখী; কাকের তাড়ায় ভুলে না। "কিক্—কিক্—কুক্—কুক্" শব্দ করিতে করিতে তাহারা পালাইবার ভাণ করে, এবং কাকেরা বাসা ছাড়িয়া পিছনে পিছনে ছুটিয়া চলে। এই রকমে কাকেরা যখন বাসা ছাড়িয়া কোকিল তাড়াইবার জন্য খুব দূরে যায়, তখন স্ত্রী-কোকিল পাতার আড়াল হইতে বাহির হইয়া কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। কেবল ইহাই নয়,—যদি বাসা কাকের ডিমে ভরা থাকে, তবে স্ত্রী-কোকিলরা দুই-চারিটা ডিম মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই শূন্য জায়গায় নিজেদের ডিম পাড়ে। দেখ কোকিলরা কত দুষ্ট। কাকেরা বোধ হয় মনে ভাবে, তাহারাই পাখীদের মধ্যে বুদ্ধিমান্। কিন্তু কোকিলদের কাছে তাহাদের প্রায়ই হার মানিতে হয়।

পাপিয়া ও কুকো

তোমরা পাপিয়া পাখীদের বোধ করি দেখ নাই। ইহারা কোকিলদেরই মতো পাতার আড়ালে লুকাইয়া ডাকে; ফাঁকা ডালে প্রায়ই বসে না। তাই ইহাদের দেখা মুস্কিল। পাপিয়াদের গায়ের পালকের রঙ্ যেন কতকটা ধূসর, তাহারি উপরে কাল্চে ডোরা থাকে। কিন্তু পেটের তলা সাদা। তাই হঠাৎ দেখিলে ইহাদের শিক্‌রা পাখী বলিয়া ভুল হয়।

পাপিয়া পাখীদের চেহারা না দেখিলেও তাহাদের ডাক তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। কি সুন্দর ডাক! নীচু স্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া তাহারা সুর চড়াইতে চড়াইতে সপ্তমে গিয়া হাজির হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে যদি এক জোড়া পাপিয়া বাগানে থাকে, তবে সমস্ত বাগান তাহাদের সুরে ভরিয়া উঠে। রাত্রিতেও তাহাদের ডাকের বিরাম থাকে না। জ্যোৎস্না রাত্রি থাকিলে তাহারা আপন খেয়ালে গান করিয়াই সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দেয়। লোকে বলে, পাপিয়ারা "চোখ্ গেল" "চোখ্ গেল" করিয়া ডাকে। তাই লোকে তাহাদিগকে "চোখ গেল" পাখীও বলে। যাহা হউক, পাপিয়াদের গলার সুস্বর বারো মাস শুনা যায় না। ডিম পাড়ার ও বাসা বাঁধার সময় আসিলে কোকিলদের মতো পাপিয়াদের গলা খুলিয়া যায়। তখন তাহারা

"চোখ গেল" করিয়া দিবারাত্রি ডাকে। তার পরে জ্যৈষ্ঠের শেষে কোকিলদের মতো ইহাদেরো গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায়। তাই ডাক শুনিতে না পাইয়া অনেকে মনে করে, বসন্ত ও গ্রীষ্ম কাল বাংলা দেশে কাটাইয়া পাপিয়ারা বর্ষাকালে অন্য দেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। কোকিলদের মতো ইহারা বারো মাসই পাতার আড়ালে লুকাইয়া আমাদের দেশে কাটায়।

ভালো মানুষের মতো পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকিলেও পাপিয়াদের মধ্যে যথেষ্ট দুষ্টামি আছে। কোকিলরা কি রকমে কাকের বাসায় ডিম পাড়ে, তাহা আগে বলিয়াছি। পাপিয়ারাও নাকি সেই রকমে ছাতারে পাখীদের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারেরা সেই সব ডিম নিজেদেরি মনে করে এবং তা দিয়া সেগুলি হইতে বাচ্চা বাহির করে। কাজেই, পাপিয়াদের বাসা বাঁধিতে হয় না এবং ডিমেও তা দিতে হয় না

কুকো পাখী তোমরা হয় ত পল্লীগ্রামে দেখিয়াছ। ইহারা লম্বা লেজওয়ালা বেশ বড় রকমের পাখী। জঙ্গলের মধ্যে ছোটো গাছে ও বাঁশ-ঝাড়ে ইহাদের প্রায়ই দেখা যায়। বাগানের ফাঁকা জায়গায় বা গৃহস্থের বাড়ীতে ইহারা কখনো আসে না। ডানা খুব লম্বা নয়, তাই অনেক দূরে উড়িয়া বেড়াইবার শক্তিও ইহাদের থাকে না।

কুকোদের ডানাগুলির রঙ্ খয়েরি। তা ছাড়া শরীরের

অন্য সব জায়গার পালকের রঙ্ কালো। ঠোঁট ও পায়ের রঙ্ও কালো। কিন্তু চোখ্ দুটা সুন্দর লাল। কুকোরা কোকিলের জাতির পাখী হইলেও, কোকিল ও পাপিয়াদের মতো ইহারা

কুকো

পরের বাসায় ডিম পাড়ে না। কুকোদের বাসা বোধ করি তোমরা দেখ নাই। নিরিবিলি ঘন জঙ্গল বা বাঁশ ঝাড়ের মধ্যেই ইহাদের আড্ডা। তাই ঐ সব জায়গার ঘন ঝোপের মধ্যে ইহারা বাসা বাঁধে। কুকোদের বাসা কাক বা শালিকদের বাসার মতো নয়,—ইহাদের বাসার ছাদ থাকে। এবং ভিতরে যাওয়ার জন্য একটা দরজাও থাকে। দূর হইতে দেখিলে কিন্তু বাসাগুলিকে এক-একটা লতা-পতার পিণ্ড বলিয়াই মনে হয়।

কুকোরা কি রকম শব্দ করিয়া ডাকে, তাহা বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। খুব ভোরে যখন কাক-কোকিলরাও ঘুমায়, তখন কুকোরা "উঃ উঁঃ উঃ" শব্দে গম্ভীর-ভাবে ডাক জুড়িয়া দেয়। এই ডাক অনেক দূর হইতে শুনা যায়। বিছানায় শুইয়া ইহা শুনিতে মন্দ লাগে না। কুকোদের ডাক শুনিলেই বুঝা যায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোকিল ও পাপিয়াদের মতো ইহারা কখনই রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে ডাকে না।

টিয়া

এই বারে তোমাদের টিয়া পাখীদেব কথা বলিব। ইহারা বড় সুন্দর পাখী। ঠোঁট্ খুব ধারালো—আবার উপরকার ঠোঁট্‌টা সুন্দর বাঁকা। কিন্তু জিভ্ বড় ছোটো। টিয়াদের ডানা ও লেজ দেখিয়াছ কি? ইহাদের ডানা ও লেজ দুই-ই খুব লম্বা।

সাধারণ টিয়া তোমরা নিশ্চয়ই সকলে দেখিয়াছ। হয় ত তোমাদের কাহারো কাহারো বাড়ীতে পোষা টিয়া আছে। ইহাদের ঠোঁট লাল, গায়ের পালক সবুজ। তাই টিয়াব দল যখন গাছে বসিয়া থাকে, তখন সবুজ পাতার সঙ্গে তাহাদের গায়ের রঙ্ এমন মিলিয়া যায় যে, তাহাদিগকে চেনাই যায় না। সাধারণ টিয়াদের চোখ সাদা। আবার পুরুষ টিয়াদের গলায় কাঁঠি থাকে এই কাঁঠির রঙ্ বড় সুন্দর। ইহার গলার উপরকার অংশের রঙ্ গোলাপি এবং নীচের রঙ্ কালো। দেখিলে মনে হয়, কে যেন তুলি দিয়া গলার উপরে এই কণ্ঠী আঁকিয়া দিয়াছে। স্ত্রী-টিয়ার গলায় কিন্তু কণ্ঠী থাকে না। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পুরুষ টিয়ারা

গলার কণ্ঠী লইয়াই ডিম হইতে বাহির হয়। কিন্তু তাহা নয়—ছানা অবস্থায় পুরুষ টিয়ার গলায় কণ্ঠী থাকে না। তাই ছানাদের মধ্যে কোন্‌টি স্ত্রী এবং কোন্‌টিই বা পুরুষ, তাহা প্রথমে বুঝা যায় না। বাচ্চা টিয়াদের চোখের রঙ্‌ কালো এবং ধাড়ীদের সাদা হয়। এই জন্য কেবল চোখের রঙ্‌ দেখিয়া কোন্‌টি বাচ্চা এবং কোন্‌টি ধাড়ী বুঝিয়া লওয়া যায়। বাচ্চা টিয়াদের পুষিলে, তাহারা মানুষের গলার স্বর নকল করিতে পারে। কিন্তু টিয়ারা ময়নাদের মতো স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না।

টিয়া

চন্দনা টিয়া-জাতিরই পাখী, কিন্তু টিয়ার চেয়ে আকারে বড়। ইহাদের ডানার পালকের উপরে, এক একটা লাল ছোপ থাকে। তাই ইহারা সাধারণ টিয়ার চেয়ে দেখিতে অনেক সুন্দর। ইহা ছাড়া মদনা, কাজ্‌লা ইত্যাদি আরো কয়েক রকম টিযা আছে। মদনাদের বুক লাল। আবার পুরুষ-মদনাদের মাথায় নীল রঙের পালক থাকে। কিন্তু ছোটো বেলায় মদনাদেন গায়ের পালকের রঙ্‌ সাধারণ টিয়াদের মতোই সবুজ থাকে। কাজ্‌লাদের পালকের রঙ্‌ আবার অন্য রকম। ইহাদের লেজের শেষের রঙ্‌ হল্‌দে এবং মাথার রঙ্‌ কতকটা মেটে ধরণের।

লটকান পাখী তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারাও

টিয়া-জাতীয়। কিন্তু ভারি মজার পাখী। খাঁচায় রাখিলে খাঁচার দাঁড়ে পা বাধাইয়া ইহারা বাদুড়ের মতো ঝুলিতে থাকে। আবার দুষ্টামিও ইহাদের যথেষ্ট আছে। পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি করা এবং অন্য ছোটো পাখীদের বাসায় গিয়া ডিম চুরি করিয়া খাওয়া ইহাদের ভারি বদ্ অভ্যাস।

টিয়া পাখীরা শালিকদের মতো বাড়ীর ফাটালে এবং কখনো বা গাছের কোটরে বাসা করে। বড় পাখীদের দেখিতে সুন্দর হইলেও, টিয়ার বাচ্চাদের দেখিতে কিন্তু ভারি বিশ্রী। তখন তাহাদের গায়ে সে-রকম পালক থাকে না এবং যে পালক থাকে তাহাতে রঙের বাহারও দেখা যায় না। পালের ভেড়ারা যেমন গাদাগাদি করিয়া একই জায়গায় তাল পাকাইয়া থাকিতে ভালবাসে, টিয়ার ছানাদের ঠিক্ সেই রকম থাকার অভ্যাস আছে। এক খাঁচার মধ্যে তিন-চারিটা বাচ্চা রাখিলে তাহারা এক জায়গায় জড় হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

যাহা হউক, টিয়া পাখীরা কিন্তু আমাদের বড় অপকার করে। ইহারা পোকামাকড় খায় না। গাছের ফল কুঁড়ি এবং ফুলই ইহাদের প্রধান আহার। তা ছাড়া ছোলা মটর ধান গম যব প্রভৃতি শস্যও ইহারা খায়। তাই যেখানে বেশী টিয়া পাখী থাকে সেখানকার বাগানের গাছে ফল বা ফুল ধরিলে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া আসিয়া সেগুলিকে নষ্ট করে। ভুট্টা ও জোয়ারের ক্ষেতে ফুল দেখা দিলেই, টিয়ারা

সেখানে দলে দলে আনাগোনা সুরু করে এবং ফুলে ফলে ভরা বড় বড় শীষ্ কাটিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তাই যেখানে টিয়ার উপদ্রব বেশি সেখানে সমস্ত দিনই ক্ষেতে পাহারা দিতে হয়।

কাকাতুয়ারা টিয়া জাতিরই পাখী। কিন্তু ইহারা ভারত-বর্ষের পাখী নয়। তোমরা যে-সব কাকাতুয়া দেখিতে পাও, সেগুলিকে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ধরিয়া এদেশে বিক্রয়ের জন্য আনা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার বনে-জঙ্গলে টিয়াদের মতো কাকা-তুয়ারা ঝাঁকে ঝাঁকে চরিয়া বেড়ায়। সাধারণ কাকাতুয়ার গায়ের পালকের রঙ্ সাদা—কেবল মাথার ঝুঁটিটা ফিকে হল্‌দে।

কাঠ্ঠোকরা

কাঠ্ঠোক্রা পাখীদের একটু চেষ্টা করিলেই তোমরা বাগানে দেখিতে পাইবে। ইহারা গাছের গায়ে নখ আট্কাইয়া ঠোকর মারে। এই জন্যই ইহাদের নাম "কাঠ্ঠোক্রা" হইয়াছে। কাঠ্ঠোক্রাদের মাথায় ঝুঁটি থাকে। তা ছাড়া ইহাদের ঠোঁট খুব লম্বা ও পায়ের নখ বেশ ধারালো। এই সব লক্ষণ দেখিয়া তোমরা হয় ত কাঠ্ঠোকরাদের চিনিয়া লইতে পারিবে। গাছের শুক্না পচা ডাল-পালার ভিতরে যে-সব পোকামাকড় থাকে, তাহাই ইহাদের প্রধান আহার। তাই উহারা গাছের গায়ে পা ও লেজ বাধাইয়া কাঠে ঠোকর দেয়। ইহাতে পচা ও শুক্না কাঠের নীচে যে-সব পোকামাকড় থাকে, তাহা বাহির হইয়া পড়ে; তার পরে উহারা সেইগুলিই লম্বা জিভ্ দিয়া মুখে পূরিয়া খাইয়া ফেলে। তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই

কাঠঠোক্রা

কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের কাঠে ঠোকর মারার "ক—ট—র—র—র—র"—শব্দ শুনিতে পাইবে।

কাঠ ঠুক্‌রাইয়া পোকা বাহির করার জন্য কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের ঠোঁট খুব ধারালো এবং গাছ আঁক্‌ড়াইয়া ধরার জন্য পায়ের নখও খুব শক্ত ও ছুঁচ্‌লো থাকে। সকলেরই প্রাণের ভয় আছে; ঠোঁটের ঠোকর খাইয়া যে-সব পোকামাকড় গাছের পচা কাঠ হইতে বাহিরে আসে, চট্‌ করিয়া মুখে না পুরিলে তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া যায়। তাই পোকা ধরার জন্য কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের জিভে সুন্দর ব্যবস্থা আছে। ব্যাঙরা কি-রকমে পোকা ধরিয়া মুখে পোরে, তোমরা হয়ত তাহা দেখিয়াছ। ব্যাঙের জিভ্‌ খুব লম্বা,—সেই লম্বা জিভ্‌ বাহির করিয়া পোকা ধরিয়া সে মুখে পোরে। কাঠ্‌ঠোক্‌রারা ঠোঁট দিয়া পোকা না ধরিয়া ব্যাঙ্‌দের মতো জিভ্‌ দিয়াই পোকা ধরে, এই জন্য ইহাদেরো জিভ্‌ বেশ লম্বা। কেবল ইহাই নয়,—কাঠ্‌ঠোক্‌রার জিভের আগায় ছুঁচের মতো কাঁটা এবং এক রকম আঠা লাগানো থাকে। সেই কাঁটায় বিঁধিয়া ও আঠায় জড়াইয়া ইহারা পোকাদের মুখে পোরে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই রকমের কাঠ্‌ঠোক্‌রা দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে ছাপান্ন উপজাতির কাঠ্‌-ঠোক্‌রা আছে। গা সাদা ও কালো পালকে ঢাকা এবং মাথায় লাল ঝুঁটি-ওয়ালা কাঠ্‌ঠোক্‌রা সাধারণতঃ আমাদের

নজরে পড়ে। একটু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে তোমরা ইহাদের মাথার পালকগুলিকে হলদে এবং পেটের কতকটা জায়গার পালককে লাল দেখিতে পাইবে। লাল ঝুঁটি কিন্তু পুরুষ কাঠ্‌ঠোক্‌রাদেরই থাকে।

কাঠ্‌ঠোক্‌রা

যখন ইহারা গাছের ছালে ছুঁচ্‌লো নখগুলিকে বাধাইয়া, থম্‌কিয়া থম্‌কিয়া গাছের উপরে উঠে, তখন দেখিতে বড় মজা লাগে। অন্য পাখীদের মতো এই কাঠ্‌ঠোক্‌রারা ভালো উড়িতে পারে না,—ইহাদের উড়িবার ভঙ্গী কতকটা যেন ঢেউয়ের মতো; ঠিক্ সোজা উড়িতে পারে না। ইহা ছাড়া আর যে কাঠ্‌ঠোক্‌রা দেখা যায়, তাহাদের গায়ের রঙ্ খয়েরি।

অন্য পাখীরা যেমন খড়কুটা ও লতাপাতা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে, কাঠ্‌ঠোক্‌রারা তাহা করে না। তাহারা বাটালির মতো ধারালো লম্বা ঠোঁট দিয়া গাছের গুঁড়ি কুরিয়া গর্ত্ত করে,—এই গর্ত্তই তাহাদের বাসা। পাখীদের বাসা প্রায়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাহাতে কোনো ময়লা জিনিস থাকে না। কিন্তু কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের বাসায় ঠিক্ তাহার উল্‌টা দেখা যায়। ইহাদের কোটরগুলি বিষ্ঠা, গায়ের খসা-পালক এবং পোকামাকড়ের শরীরের খোলায় ভর্ত্তি থাকে। এই সব জিনিস পচিলে বাসাগুলিতে দুর্গন্ধও হয়। কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের ডিমগুলি ফুট্‌ফুটে সাদা। ইহাদের

স্ত্রী ও পুরুষ দুইয়ে মিলিয়া বাচ্চাদের যত্ন করে এবং যখন গাছের গুঁড়ি কুরিয়া বাসা তৈয়ারি করিতে হয়, তখনও স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া পরিশ্রম করে;—কেহ কাহাকেও ফাঁকি দিতে চায় না।

কাঠ্‌ঠোক্‌রাদের সবই ভালো,—কিন্তু ইহাদের গলার স্বর একটুও ভালো নয়। ইহাদের গলার "ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌" শব্দে যেন কান জ্বালা করে।

বসন্ত বউরি

বসন্ত বউরি পাখীর আর একটা নাম "গয়লা বুড়ী"। কেন এই নাম হইল জানি না। ইহাদের চেহারা কিন্তু "গয়লা বুড়ীর" মতো একবারে নয়। বসন্ত বউরিদের ডাক তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। মাঘ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বাগানের গাছে বসিয়া ইহারা "টঙ্ টঙ্" শব্দ করিয়া ডাকে; মনে হয় যেন, কামারের দোকানে হাতুড়ি পেটার শব্দ হইতেছে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহাদের ডাকের বিরাম থাকে না। বৈশাখ মাসের দুপুরে যখন চারিদিক রৌদ্রতে ঝাঁ ঝাঁ করে, তৃষ্ণায় যখন কাকদেরও গলা শুকাইয়া আসে, তখনো গয়লা বুড়ীর "টক্ টক্ টঙ্ টঙ্" ডাকের শব্দ শুনা যায়।

বসন্ত বউরির ডাক শুনা সহজ, কিন্তু পাখীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেখা কঠিন। ইহারা ডাকিবার সময়ে একবার ডাইনে, একবার বামে ঘাড় বাঁকায়। তাই কোন্ দিক হইতে শব্দ হইতেছে তাহা সহজে বুঝা যায় না। একদিন আম-বাগানে অনেকগুলি বসন্ত বউরি ডাকিতেছে শুনিয়া পাখীর

চেহারা দেখিবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম। গাছের তলায় অনেক ঘুরিয়াও কিন্তু পাখীর সন্ধান করিতে পারি নাই। এখনি যে-গাছ হইতে শব্দ আসিল, পরের মুহূর্তে মনে হইতে লাগিল যেন দূর হইতে শব্দ আসিতেছে।

যাহা হউক, তোমরা একটু খোঁজ করিয়া বসন্ত বউরি পাখী দেখিয়ো। ইহারা যেন আকারে চড়াইদের চেয়েও ছোটো,—কিন্তু ডাক শুনিলে মনে হয়, যেন কত বড় পাখীই ডাকিতেছে! বসন্ত বউরিদের গায়ের পালকের রঙ্ সবুজ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটার মতো লাল ফোঁটা আছে। তারপরে আবার দুই

বসন্ত বউরি

গালের রঙ যেন হলদে এবং পা দু'খানি লাল টুকটুকে। গায়ে হলদে সবুজ ও লালের এত বাহার থাকিলেও পাখীগুলিকে কিন্তু দেখিতে একটুও ভালো নয়। ঠোঁট্ মোটা এবং কালো। আবার তাহার গোড়ায় বিড়ালের গোঁফের মতো চুল লাগানো আছে। এ রকম চুল থাকে কেন, তাহা জানি না। কাঠ্‌ঠোক্‌রা ও টিয়া পাখীদের মতো বসন্ত বউরিদের পায়ের দু'টা আঙুল সম্মুখে এবং দু'টা পিছনে থাকে। এই আঙুলের নখ দিয়া ইহাদিগকে গাছের গুঁড়ি আঁক্‌ড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। ফল-ফুলারি ও পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান আহার। তাই মনে হয়, গুঁড়ি আঁকড়াইয়া ইহারা গাছের ছাল হইতে পোকা ধরিয়া খায়।

আমরা বসন্ত বউরিদের বাসা দেখিয়াছি। কাঠ্-ঠোক্‌রাদের মতো ইহারা গাছের পচা ও শুক্‌না ডালে গর্ত্ত করিয়া তাহারি ভিতরে বাসা বানায়। বর্ষার প্রথমে ইহাদের ডিম হয়। তাই ডিমে তা দেওয়া ও ছানাদের পালন করার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া বর্ষাকালে বসন্ত বউরিদের ডাক বেশি শুনা যায় না।

নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ পাখীরা বসন্ত বউরিদেরই জাত-ভাই। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলায় এই পাখীদের খুব দেখা যায়। কলিকাতা অঞ্চলে এবং উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে তোমরা ইহাদের কদাচিৎ দেখিতে পাইবে। যাহা হউক, নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের মাথা, গলা, ঘাড় যেন কতকটা খয়েরি রঙের। কিন্তু ডানা ও লেজের পালকে যে নীল রঙ্ থাকে, তাহা দেখিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। যখন ইহারা এক গাছ হইতে ধীরে ধীরে উড়িয়া আর এক গাছে যায়, তখন মনে হয় যেন কেহ নানা রঙের কাগজের পাখী বানাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। পাখীগুলা নিতান্ত ছোটো নয়,—আকারে সাধারণ শালিকদের চেয়ে অনেক বড়।

যাহা হউক, নীলকণ্ঠ পাখীরা ভয়ানক ঝগড়াটে। কখনো কখনো নিজেদেরি মধ্যে মারামারি করিয়া মরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চীৎকার করে। চেহারা ভালো হইলেও গলার স্বর কিন্তু ভয়ানক বিশ্রী।

নীলকণ্ঠেরা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের কোটরে বা

লোকের বাড়ির নালার ফাঁকে বাসা তৈয়ারি করিয়া সেখানে

নীলকণ্ঠ

ডিম পাড়ে। এই সময়ে ইহাদের মেজাজ যেন আরো রুক্ষ হয় ;—তখন সর্ব্বদা "ক্যাঁ ক্যাঁ" শব্দে চীৎকার করে। এমন কি, কাক ও চিলদের কাছে পাইলে তাহাদেরো তাড়া করে ; আবার সঙ্গে সঙ্গে নানা ভঙ্গীতে উড়িয়া বেড়ায়। কাকের সঙ্গে নীলকণ্ঠ পাখীদের ভয়ানক শত্রুতা। কাকেরা সুবিধা পাইলেই ইহাদের ঠোক্‌রাইতে যায়।

ছোটো পোকা-মাকড়ই নীলকণ্ঠ পাখীদের প্রধান আহার। তাই অনেক সময় তোমরা ইহাদিগকে মাটিতে ঘাসের উপর চরিতে দেখিবে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা গাছের পোকা- মাকড়ই ধরিয়া খায়।

মাছরাঙা

নদীর ধারের গাছে খালে বিলে ও পুষ্করিণীতে লম্বা ঠোঁট্ওয়ালা মাছরাঙা পাখী তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের ঠোঁট্ যেমন লম্বা, লেজ তেমনি ছোটো।

তোমরা কত রকমের মাছরাঙা দেখিয়াছ জানি না; কিন্তু আমরা তিন রকমের দেখিয়াছি। খাল বা বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া একটু খোঁজ করিলে তোমরা দুই-এক রকমের মাছরাঙা দেখিতে পাইবে।

নীলমাথা মাছরাঙা আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়। ইহাদের মাথা পিঠ ডানা লেজ সবই নীল। লেজের রঙ্ যত গাঢ়, পিঠের সে রকম নয়। আবার ডানায় নীলের সঙ্গে যেন সবুজের আমেজও আছে। পা দু'খানি লাল, কিন্তু লম্বা ঠোঁট জোড়াটা কালো। ইহারা পুকুর বা বিলের ধারের গাছে ভালো মানুষের মতো চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পরে জলের কোনো জায়গায় মাছ দেখিতে পাইলে ঠিক্ সেই জায়গার উপরে ঘন ঘন ডানা নাড়িয়া স্থির হইয়া উড়িতে আরম্ভ করে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, এই সময়ে মাছরাঙাদের মাথা থাকে নীচের দিকে

এবং পা থাকে উপরের দিকে। যাহা হউক, এই রকমে কিছু ক্ষণ উড়িয়া উহারা ঝপাৎ করিয়া জলে পড়িয়া মাছ ধরিয়া ফেলে। কখনো কখনো জলের ভিতরে পোঁতা গোঁজ বা খোঁটার উপরেও ইহাদিগকে এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা কাল মাছ ধরিবার জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি?

ইহা ছাড়া আর এক জাতের সাদা-বুক মাছরাঙা আমাদের দেশে দেখা যায়। এগুলিকেও দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহাদের লেজ ও ডানা নীল। মাথা ও পেট খয়েরি রঙের। কিন্তু গলা বুক ও গাল সাদা। আবার পা ও ঠোঁট লাল। এই নানা রঙের বাহারে পাখীগুলিকে দেখিলেই যেন পুষিতে ইচ্ছা হয়। আগে যে মাছরাঙাদের কথা বলিয়াছি তাহাদের চেয়ে ইহারা আকারে কিছু বড়।

জলাশয়ের ধার ছাড়া এই মাছরাঙাদের তোমরা মাঠে-ঘাটেও উড়িয়া বেড়াইতে দেখিবে। যখন মাছ বেশি জোটে না, তখন ইহারা মাঠে গিয়া ফড়িং ও অন্য পোকামাকড় খাইয়া পেট ভরায়। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, উড়িবার সময়ে ইহারা ভয়ানক চীৎকার করে। মাছরাঙাদের বাসা খুঁজিয়া বাহির করা বড় মুস্কিল। ইহারা গাছের ডালে বা লোকের বাড়ীতে বাসা করে না। জলাশয় হইতে দূরে কোনো

মাছরাঙা

নির্জ্জন জায়গায় ইহারা মাটিতে যে লম্বা সুড়ঙ্গ তৈয়ারি করে, তাহাই ইহাদের বাসা। সেইখানেই মাছরাঙারা ডিম পাড়ে। আমরা মাছরাঙার বাসা স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, সুড়ঙ্গের মধ্যে খড়কুটা না বিছাইয়াই ইহারা ডিম পাড়ে। ইহাদের ডিমের রঙ্ লাল্‌চে। বাসার মধ্যে প্রায়ই গাদা গাদা মাছের কাঁটা জমা থাকে। বোধ করি, নিজেরা মাছ খাইয়া এবং বাচ্চাদের মাছ খাওয়াইয়া কাঁটাগুলিকে আর বাসা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দেয় না। তাই মাছরাঙাদের বাসা ভারি নোংরা।

বাঁশপাতি

মাছরাঙাদের এক জাত-ভাইয়ের কথা তোমাদিগকে এখানে বলিব। ইহাদিগকে বাঁশপাতি পাখী বলে; কেহ কেহ আবার ইহাদের "পত্রিঙ্গা" ও বলিয়া ডাকে। তোমরা এই পাখী দেখ নাই কি? আকারে ইহারা চড়াইদের চেয়ে বড় হয় না। কিন্তু লেজগুলি খুব লম্বা। দূর হইতে দেখিলে ইহাদের সবুজ পাখী বলিয়া মনে হয়। গায়ের পালকের রঙ্ বাঁশের পাতার মতো সবুজ বলিয়াই বোধ হয় এই পাখীদের নাম দেওয়া হইয়াছে "বাঁশপাতি।" কিন্তু ভালো করিয়া লক্ষ্য করিলে ইহাদের গায়ে নানা রঙের পালক দেখা যায়। লেজের লম্বা পালকগুলির রঙ্ কতকটা নীল। আবার এই পালকগুলির মধ্যে মাঝের দুইটা পালক বেশী লম্বা। গলার রঙ্ পেয়ালা,—কিন্তু দুই গালের কতকগুলা পালকের রঙ্ সাদা এবং চোখ দু'টা লাল।

বাঁশপাতিরা ছোটো পোকামাকড় খাইয়াই পেট ভরায়।

কখন কখন সুবিধা পাইলে ইহারা মৌ-মাছি ও বোল্‌তাদেরও ধরিয়া খায় শুনিয়াছি। যাহা হউক লেজ লম্বা বলিয়া এই পাখীরা সর্ব্বদা বিব্রত থাকে,—মাটীর উপরে চরিয়া বেড়াইতে পারে না। তাই ফিঙেদের মতো উঁচু জায়গায় বসিয়া কোথায় কোন্ পোকা-মাকড় উড়িতেছে, তাহা ইহারা দেখিয়া লয়, তার পরে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া সেগুলিকে খাইয়া ফেলে। শীতকালেই আমাদের দেশে বাঁশপাতি পাখী দেখা যায়। তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিবে, সবুজ রঙের এই ছোটো পাখীগুলি টেলিগ্রাফের তারে বা গাছের শুক্‌না ডালের আগায় বসিয়া পোকার সন্ধানে চারিদিকে তাকাইতেছে এবং মাঝে মাঝে ছোঁ মারিয়া পোকা ধরিতেছে।

বাঁশপাতি

বাঁশপাতিদের বাসা অনেক খোঁজ করিয়াও দেখিতে পাই নাই। যাঁহারা বাসা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—ইহারা নখ ও ঠোঁট্ দিয়া বাগানের নিরিবিলি জায়গায় বা নদীর ভাঙনে সুড়ঙ্গ করে। এই সুড়ঙ্গই ইহাদের বাসা হয়।

টুনটুনি

ইংরেজিতে টুন্‌টুনি পাখীদের "দরজী পাখী" বলা হয়। কেন—তাহা বোধ করি তোমরা জানো। ইহারা গাছের পাতা ঠোঙার মতো মুড়িয়া তাহার পাশ সুতা বা গাছের আঁশ দিয়া সুন্দর করিয়া সেলাই করে এবং সেই ঠোঙার মধ্যে পালক বা তূলা বিছাইয়া ডিম পাড়ে। দরজীর মতো পাতা সেলাই করে বলিয়াই ইহাদিগকে "দরজী পাখী" বলা হয়। কাপড় সেলাই করিতে হইলে, আমাদের ছুঁচ্ সুতা ইত্যাদির দরকার হয়,—কিন্তু টুন্‌টুনিদের সে-সব কিছুই জোগাড় করিতে হয় না। উহাদের ঠোঁট্ ছুঁচের কাজ করে এবং গাছের ছালের আঁশ জোগাড় করিয়া উহারা সুতার কাজ চালায়। এই পাখীরা কেমন করিয়া সেলাই করার বিদ্যা শিখিল, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

টুন্‌টুনি পাখীদের তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আকারে ইহারা চড়াই পাখীর চেয়েও অনেক ছোট নয় কি ? ইহাদের পিঠের রঙ্ যেন কতকটা খয়েরি কিন্তু মাথা ধূসর। পেটের তলার পালক সাদাটে। লেজ সাধারণতঃ খুব লম্বা নয়,—

কিন্তু ডিম পাড়ার সময়ে পুরুষ-পাখীদের লেজের মাঝের দুটো পালক হঠাৎ লম্বা হইয়া পড়ে। তাই সেই সময়ে পুরুষ-পাখীদের লেজ লম্বা দেখা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ-ভাদ্র পর্য্যন্ত "টুইজ্ টুইজ্" শব্দ করিয়া ইহারা ঝোপ-জঙ্গলের উপরে ক্রমাগত লাফালাফি করে। পাখীগুলি ছোটো,—কিন্তু তাহাদের গলার স্বর নিতান্ত ছোটো নয়। যখন টুন্‌টুনিরা গাছের ডালে লাফালাফি করিয়া ডাকিতে থাকে, তখন তাহা অনেক দূব হইতে শুনা যায়।

টুন্‌টুনি

টুনটুনি পাখীদের তোমরা যদি কেহ আজও না দেখিয়া থাক,—খোঁজ করিয়া দেখিয়া লইয়ো। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের বাগানে খোঁজ করিলেই ইহাদের দেখিতে পাইবে। ইহারা বড় চঞ্চল পাখী। একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিলে ইহা-দের চাল-চলন জানিতে পারিবে। সেই পাতার ঠোঙার মতো বাসায় তূলা বিছাইয়া টুন্‌টুনিরা তিন-চারিটি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হঠাৎ দেখিতে সাদা, কিন্তু ভালো করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সাদার উপরে লালের ছিটাফোঁটা আছে।

সাত-সয়ালি

সাত-সয়ালি পাখীদের আর এক নাম সাত-সতী। এই নাম কেন হইল জানি না। কিন্তু পাখীগুলি বড় সুন্দর। মাথা ও ঘাড় কালো। পিছন দিক্ ও পেটের তলার রঙ্ আল্তার মতো। ডানা কালো, কিন্তু তাহার উপর আল্তা রঙের ডোরা আছে। পাখীগুলি ছোটো, কিন্তু কখনই একা-একা বেড়ায় না। অনেকে মিলিয়া গাছে গাছে লাফাইয়া পোকামাকড়ের সন্ধান করে।

টুন্টুনির মতো সাত-সয়ালিদেরও স্ত্রী-পুরুষের চেহারায় প্রভেদ আছে। স্ত্রী-পাখীর গায়ের পালকের রঙ্ হল্দে এবং কালোতে মিশানো। কিন্তু রঙের বাহার থাকে পুরুষের গায়েই বেশি।

এই পাখীদের আর এক উপজাতিকে ছোটো সয়ালি বলা হয়। ইহাদের মাথা ধূসর, কিন্তু বুকের পালকের রঙ্ লাল। সয়ালি পাখীদের সর্ব্বদা দেখা যায় না, তাই ইহাদের কথা তোমাদিগকে বেশি কিছু বলিলাম না। তোমরা যদি একটু নজর রাখ, তাহা হইলে তোমাদের বাগানেই ইহাদিগকে কখনো কখনো দেখিতে পাইবে।

ভরত পাখী

তোমরা এই সরু-ঠোঁট্ পাখীদের দেখিয়াছ কি-না জানি না। ইহাদের দল বাঁধিয়া প্রায়ই জলাশয়ের ধারে চরিতে দেখা যায়। খঞ্জন পাখীদের আকৃতির সঙ্গে ইহাদের অনেক মিল আছে। কিন্তু রঙ্ খঞ্জনের মত নয়,—লেজও সে-রকম লম্বা নয়। ভরত পাখীদের মাথায় ছোটো ঝুঁটি থাকে,—ডানার রঙ্ যেন কতকটা খয়েরি।

ভরত পাখী

ভরত পাখীর ডাক বড় মিষ্ট। তাহা ঠিক্ শিষ্ দেওয়ার মতো শুনায়। অন্য পাখীর মতো ইহারা গাছের ডালে বসিয়া ডাকে না,—উড়িতে উড়িতে আকাশের উপরের দিকে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিষ্ দেয়। ভরত পাখীদের বাসা আমরা দেখি নাই। শুনিয়াছি, ইহারা মাটিতে গর্ত্ত করে এবং সেখানে ডিম পাড়ে।

ধূলা-চটা নামে আমাদের দেশে আর এক রকম পাখী আছে। ইহারাও ভরত-জাতির পাখী। ইহাদিগকেও ঝাঁকে ঝাঁকে মাঠে চরিতে দেখা যায়। ভরত পাখীর মতো ইহারা আকাশে উঠা-নামা করিয়া উড়িয়া বেড়ায়। পুরুষ ধূলা-চটাদের পালকের রঙ্ কাল্‌চে,—স্ত্রীদের রঙ্ কতকটা সাদা।

তালচোঁচ

তালচোঁচেরা ঘরের কড়ি-বরগার ফাঁকে ও কার্ণিসের গায়ে বাসা করে। তাই ইহাদের দেখিবার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তোমরা এই পাখীদের আকৃতি ভালো করিয়া দেখিয়াছ কি? আকারে ইহারা চড়াইয়ের চেয়ে একটু বড়; কিন্তু রঙ্ কাল্‌চে। পিঠে ও গলায় সাদা পালক থাকে।

তালচোঁচদের পায়ের আঙুলগুলি বড় মজার। সাধারণ পাখীদের পায়ের তিনটা আঙুল যেমন সম্মুখে এবং একটা পিছনে থাকে, ইহাদের পায়ের আঙুলগুলিকে সে-রকমে সাজানো দেখা যায় না। আমাদের হাত-পায়ের আঙুলের মতো উহাদের চারিটা আঙুলই সাম্‌নে ছড়ানো থাকে। তাই ইহারা কখনই গাছের ডালে বসিতে পারে না। আমরা তালচোঁচ পাখীদের মাটিতে ছাড়িয়া দিয়া দেখিয়াছি, তাহারা নানা ভঙ্গীতে ব্যাঙের মতো থপ্ থপ্ করিয়া লাফাইয়া পালাইতে চায়। কিন্তু তাহাদের নখগুলি ভারি ছুঁচ্‌লো। নখে একবার কাপড় আট্‌কাইয়া গেলে, তাহা ছাড়ানো মুস্কিল হয়।

অন্য পাখীদের মতো তালচোঁচেরা একা একা থাকিতে ভালবাসে না। এক এক জায়গায় এক এক দল পাখী বাসা করে এবং যখন উড়িয়া বেড়ায়, তখনো ঝাঁক বাঁধিয়া উড়ে। তোমরা যখন বিকালে খেলা কর, তালচোঁচদেরও সেই সময়ে খেলার ধূম লাগিয়া যায়। তখন তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসার চারিদিকে চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া যে-সব পোকা-মাকড় সম্মুখে উড়িতে দেখে, তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। ইহাদের খাবার-সংগ্রহের রীতিই এই রকম,—উড়িতে উড়িতে যাহা মুখের গোড়ায় আসে, তাহাই খায়। এই জন্যই সকাল-বিকালে ইহাদিগকে খুব ফূর্ত্তি করিয়া উড়িতে দেখা যায়। তালচোঁচদের ডাক তোমরা হয় ত শুনিয়াছ,—ইহা যেন হুইসিল্ বাঁশির শব্দের মতো। শুনিতে ভারি খারাপ লাগে।

তালচোঁচদের বাসা তোমরা দেখ নাই কি? তোমাদের বাড়ীর পূজার দালানে বা গ্রামের শিব-মন্দিরে খোঁজ করিলে ইহাদের বাসা দেখিতে পাইবে। তালচোঁচদের মুখের লালা ঠিক্ জিউলির আঠার মতো চট্‌চটে। সেই লালা এবং গায়ের খসা-পালক দিয়া ইহারা জমাট রকমের বাসা তৈয়ারি করে। পালকগুলি লালায় জড়াইয়া শুকাইলে খুব শক্ত হয়। চীনা মুলুকের এক রকম তালচোঁচ লালা দিয়া যে বাসা তৈয়ারি করে, তাহা নাকি খুব সুস্বাদু খাদ্য। লোকে অনেক কষ্ট করিয়া ঐ সব বাসা

তালচোঁচ

ভাঙ্গিয়া আনে এবং তার পরে তাহার ঝোল তৈয়ারি করিয়া খায়। যাহা হউক, আমাদের দেশের তালচোঁচের বাসা দিয়া বোধ করি ঝোল ভালো হয় না,—হইলে ইহাদের একটা বাসাও আমরা দেখিতে পাইতাম না। লোকে সব বাসা ভাঙ্গিয়া ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া খাইত।

তালচোঁচদের বৎসরে দুই বার করিয়া ডিম হয়। ডিম-গুলি দেখিতে সাদা ও লম্বাটে ধরণের। কিন্তু এক-একবারে ইহারা দুইটা বা তিনটার বেশি ডিম পাড়ে না।

আবাবিল

এই পাখীদের তোমরা দেখিয়াছ কিনা জানি না। অনেকে ইহাদিগকে তালচোঁচ-জাতির পাখী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আবাবিল ও তালচোঁচ পৃথক্ জাতির পাখী। আবাবিলের পায়ের নখ, চেহারা এবং বাসা তালচোঁচদের তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তালচোঁচেরা গাছের ডালে বসিতে পারে না, কিন্তু আবাবিলেরা ডালে বসে ও দরকার হইলে মাটিতে হাঁটিয়া বেড়ায়।

আমরা সচরাচর যে-সব আবাবিল দেখিতে পাই, তাহাদের পিঠের পালকের রঙ্ কালো কিন্তু বুক ও পেটের রঙ্ সাদা; লেজেও সাদা ফুট্‌কি আছে। মুখ ও গলা আবার কতকটা খয়েরি রঙের পালকে ঢাকা থাকে। ইহাদের বাসা-গুলি অতি সুন্দর। কোথা হইতে কাদা বহিয়া আনিয়া ইহারা পেয়ালার আকারে কাদার বাসা তৈয়ারি করে এবং কাদার উপরে আবার ঝরা-পালক লাগাইয়া দেয়। কখনো কখনো বাড়ীর কড়ি-বরগার ফাঁকে ও কার্ণিসে এই রকম বাসা অনেক দেখা যায়। ইহারাও দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে এবং অনেকে এক জায়গায় বাসা তৈয়ারি করে।

আবাবিলেরা তালচোঁচদেরই মতো ফুর্ত্তিবাজ পাখী। ইহাদিগকে একদণ্ডও স্থির থাকিতে দেখা যায় না; ঝাঁকে

ঝাঁকে উড়িয়া বাসার কাছে চীৎকার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উড়ন্ত পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়। অন্য পাখীদের মতো ইহারা লতাপাতায় বা ঘাসের মধ্যে পোকা খুঁজিয়া বেড়ায় না। উড়িতে উড়িতে এবং ডাকিতে ডাকিতে পোকা শিকার করা, বৃষ্টির সময়ে উড়িতে উড়িতে স্নান করা ও জল খাওয়াই ইহাদের স্বভাব। আবাবিলেরা বেশী শীত সহ্য করিতে পারে না। তাই যে-সব দেশে বেশি শীত, সেখান হইতে ইহারা শীতকালে গরম দেশে পালাইয়া যায়,—তার পরে গ্রীষ্মকাল আসিলে স্বদেশে ফিরিয়া যায়।

আবাবিলদের ডিম বড় মজার। ইহারা সাদা ও লাল্‌চে,—দুই রকমই ডিম পাড়ে। ডিমের উপরে কখনো কখনো গাঢ় লালের ছিটা-ফোঁটাও দেখা যায়।

আমরা এখানে কেবল এক রকম আবাবিলের কথা বলিলাম। ভারতবর্ষে প্রায় কুড়ি জাতের আবাবিল দেখা যায়। নকুটি নামে এক রকম ছোটো আবাবিল নদীর ধারে প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা আকারে চড়ুই পাখীদের চেয়েও ছোটো। রঙ্ খয়েরি। ইহাদিগকে লোকের বাড়ীতে আসিয়া বাসা করিতে দেখা যায় না। তোমরা বোধ করি এই পাখীদের দেখ নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া আমরা নদীর ধারে নকুটি পাখী অনেক দেখিয়াছি।

বাবুই

বাবুই পাখীদের কেহ কেহ বায়া পাখীও বলে। গাছের ডালে বোতলের মতো বাসা বাঁধে বলিয়া ইহাদিগকে "বোতল পাখী" বলিতেও শুনিয়াছি।

বাবুই পাখীরা আকারে খুব বড় নয়। দেখিতে স্ত্রী-চড়াইয়ের মতো। গায়ের পালকের রঙ্ খয়েরি। কিন্তু ডিম পাড়ার সময় আসিলে পুরুষ-পাখীদের গায়ের রঙ্ সুন্দর হল্‌দে রকমের হইয়া দাঁড়ায় এবং গলার রঙ্ কালো হয়। স্ত্রী-বাবুইদের রঙ্ কিন্তু কোনো সময়েই বদলায় না।

চড়াই পাখীদের মতো বাবুইরা ঘাসের বীজ ও শস্য খাইয়া পেট ভরায়। ঠোঁটের গোড়ায় পোকামাকড় পাইলেও বোধ করি ছাড়ে না। বাসায় ছানা হইলে বাবুই পাখীরা কেবল পোকার সন্ধানেই ঘুরিয়া বেড়ায়। ছানারা পোকা খাইয়াই বড় হয়

বাবুইদের বাসা বড় মজার জি [illegible] ই তাল ও খেজুর-গাছের ডালে ইহারা বাসা বাঁধে। তোমরা গ্রামের বাহিরে এক-একটা গাছে হয় ত আট দশটি করিয়া বাসা ঝুলিতে দেখিবে। একা থাকা বা একা-একা বাসা বাঁধা

ইহাদের স্বভাব নয়। তাই ইহারা অনেকে মিলিয়া একই গাছে অনেক বাসা তৈয়ারি করে। কাক বা শালিক প্রভৃতির বাসার সহিত বাবুইয়ের বাসার একটুও মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাসার চেহারা যেন জল রাখার ছোটো কুঁজোর মতো। কুঁজোর গলা নীচে রাখিয়া ঝুলাইলে যে-রকম দেখায়, বাবুইয়ের বাসা যেন সেই রকম। তাল নারিকেল ও খেজুর-গছের আঁশ বা লম্বা খড়ের ছিলা দিয়া বাবুইরা বাসাগুলিকে এমন সুন্দরভাবে তৈয়ারি করে যে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। বাবুই পাখীরা কেবল ঠোঁট দিয়া যেমন সুন্দর বাসা তৈয়ারি করে, খুব ভালো কারিগর নানা যন্ত্রপাতি দিয়াও বোধ করি সে-রকম বাসা তৈয়ারি করিতে পারে না। ঠোঁট দিয়া ইহারা খড় ও গাছের ছালের আঁশগুলিকে এমন সরু করিয়া ছিঁড়ে যে, তাহা দেখিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাবুইয়ের বাসা গাছ হইতে পড়িয়া গেলে, তাহার সরু খড়কুটা দিয়া লোকে বালিশ তৈয়ারি করে। এই বালিশ তূলা-ভরা বালিশের মতোই নরম হয়।

বাসা বাঁধার সময় হইলে বাবুইরা মাঠে বা জঙ্গলে গিয়া ঠোঁট দিয়া ঘাসের ফালি এবং তাল ও খেজুর-গাছের ছালের আঁশ জোগাড় করিয়া আনে। তাল-গাছের ডালে আট্‌কাইয়া এগুলি দিয়া বাসা ঝুলাইবার দড়ির কাজ করা হয়। দড়ি ঝুলানো হইলে বাবুইরা আসল বাসা বাঁধিতে

সুরু করে। প্রথমে বাসার চেহারা হয়, দড়িতে ঝুলানো একটা ঘণ্টা বা ছাতার মতো। খোঁজ করিলে তোমরা তাল-গাছে বা খেজুর-গাছে এই রকম ঘণ্টার আকারের বাসা দেখিতে পাইবে। এই ঘণ্টার নীচে প্রায়ই একগাছি শক্ত খড়ের দড়ি দাঁড়ের মতো লাগানো দেখা যায়। বাবুইরা কাজ করিতে করিতে সেই ছাতার তলাকার দড়ির উপরে বসিয়া বিশ্রাম করে এবং গান গাহিয়া আনন্দ করে। লোকে বলে, ইহা নাকি বাবুইদের বৈঠকখানা। স্ত্রী-বাবুইরা যখন খুব মন দিয়া বাসা বোনে, তখন পুরুষ-পাখী ছাতার তলার দড়ির উপরে বসিয়া তাহাকে গান শুনাইয়া খুসী রাখে।

বাবুইরা ভারি স্ফূর্ত্তিবাজ পাখী; ধীরে ধীরে বাসা তৈয়ারি শেষ হইয়া গেলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। তখন তাহারা যে কি করিবে, তাহা ঠিক্ করিতে না পারিয়া হয়ত উড়িয়া উড়িয়া ডিগ্‌বাজী খাইতে আরম্ভ করে; কখনো বা উৎসাহের চোটে পরস্পর কামড়াকামড়ি আরম্ভ করে। বোধ করি, তখন ইহারা অন্য পাখীদের জানাইতে চায়,—"দেখ্, আমরা কেমন বাসা বেঁধেচি; তোরা বোকা, বাসা বাঁধ্‌তে জানিস্‌নে।"

অন্য পাখীরা যেমন বাসায় যাইবার সময়ে প্রথমে উড়িয়া গাছের ডালে বসে এবং তার পরে ধীরে ধীরে বাসার ভিতরে যায়, বাবুইরা তাহা করে না। ইহারা উড়িতে উড়িতে বাসার

তলাকার শুঁড়ের মতো পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। অন্য কোনো পাখী এই রকমে ভিতরে যাইতে পারে না।

বাবুই

তাই বাবুইদের ডিম প্রায়ই নষ্ট হয় না। তোমরা একটা বাবুইয়ের বাসা জোগাড় করিয়া দেখিয়ো, উহার ভিতরে ডিমে তা দিবার যে জায়গাটি আছে, তাহা কেমন সুন্দর! আমরা যেমন সন্ধ্যার সময়ে ঘরে প্রদীপ জ্বালি, বাবুইরা জোনাকি পোকা বাসায় রাখিয়া সেই রকমে বাসায় আলো দেয়,—এই রকম একটা কথা শুনা যায়। তোমরা ইহা শুনিয়াছ কি? কিন্তু আমরা কখনো বাবুইয়ের বাসায় জোনাকি দেখি নাই,—বোধ করি কথাটা ঠিক্ নয়। হাল্‌কা বাসাগুলি যাহাতে সামান্য বাতাসে বেশি নড়াচড়া না করে তাহার জন্য যে বাবুইরা বাসায় খানিকটা করিয়া কাদা রাখে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। জাহাজে যখন 'মাল' বোঝাই থাকে না, তখন উহা অল্প ঢেউয়ে ভয়ানক দুলিতে থাকে। তাই মাল্লারা জাহাজের খোলে বস্তা বস্তা বালি বা অন্য ভারি জিনিস বোঝাই রাখে। ইহাতে জাহাজের দোলা বন্ধ হয়। বাবুইদের বাসা খুব হাল্কা,—তাই অল্প বাতাসে সেগুলি ভয়ানক দোলে। এই দোল নিবারণের জন্যই বোধ করি বাবুইরা বাসায় মাটি রাখে। দেখ, এই পাখীরা কি রকম হিসাব-পত্র করিয়া বাসা তৈয়ারি করে। বাসা মনের মতো

না হইলে, ইহাদিগকে এক বাসা ছাড়িয়া মনের মতো নূতন বাসা তৈয়ারি করিতে দেখিয়াছি।

তোমরা বোধ করি মনে কর, বসন্ত কালে দক্ষিণ দিক্ হইতে বাতাস বহে এবং শীতকালে উত্তর দিক্ হইতে বাতাস আসে, ইহা বুঝি কেবল মানুষেরাই জানে। কিন্তু তাহা নয়, পশু পাখী প্রভৃতি ছোটো প্রাণীরাও তাহা বুঝিয়া-সুজিয়া চলে। শুনিয়াছি, বাবুই পাখীদের আব্‌হাওয়ার জ্ঞান নাকি খুব বেশী। তাই যে দিক্ হইতে বেশি ঝড় বা বাতাস বহা সম্ভব, ইহারা বাসার সরু মুখগুলিকে তাহারি বিপরীত দিকে রাখে। এই কথা সত্য কিনা, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই। তোমরা সুবিধা পাইলে, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো।

বাবুইদের বাসায় কখনই দুই বা তিনটার বেশি ডিম্ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ষাকালই ইহাদের ডিম পাড়ার সময়। ডিমগুলির রঙ্ সাদা। বাবুইয়ের ছানা যত্ন করিয়া পালন করিলে বেশ পোষ মানে। আমরা একবার সার্কাসে একটি বাবুই পাখীর খেলা দেখিয়াছিলাম। ঠোঁটে জ্বলন্ত ছোট মশাল লইয়া সে নানা রকম খেলা দেখাইত; ঠোঁট দিয়া পিস্তল আওয়াজ করিত। তোমরা এ রকম পোষা বাবুই দেখ নাই কি?

মধুপায়ী

আমরা যত পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে মধুপায়ী পাখীরাই বোধ হয় সব চেয়ে ছোটো। কোন্ পাখীদের আমরা মধুপায়ী বলিতেছি, তোমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? ইহাদের কেহ কেহ "মৌ-চোষা," কেহ বা "দুর্গা টুনটুনি" বলেন। তোমরা ইহাদের কোন্ নামে ডাকো, তাহা জানি না। কিন্তু তোমরা ইহাদের নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। মধুপায়ীরা আকারে তিন-চারি ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ফুলের মধু ও ফুলের ভিতরকার পোকামাকড়ই ইহাদের প্রধান আহার। তাই মৌ-মাছি ও ভ্রমরদের মতো ইহারা ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়। এক মুহূর্ত্তও ইহাদিগকে স্থির থাকিতে দেখা যায় না; কেবলি ফুলের গাছে লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। মধুপায়ীদের গায়ে এত শক্তি কোথা হইতে আসে, জানি না। আমরা আধমাইল পথ দৌড়াইতে গেলেই হাঁপাইয়া পড়ি,—কিন্তু সমস্ত দিনের লাফালাফিতে ইহারা একটুও ক্লান্ত হয় না। শিমুল গাছ যখন সরস্বতী পূজার সময়ে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন শালিক প্রভৃতি পাখীদের মহোৎসব

লাগিয়া যায়। সমস্ত দিন তাহারা শিমুল-ফুলের মধু খায়। এই মহোৎসবে আমরা মধুপায়ী পাখীদেরও যোগ দিতে দেখিয়াছি। আমাদের মনে হয়, ফুলের মধু খায় বলিয়াই ইহাদের গায়ে এত জোর। মধুপায়ীদের ঠোঁটগুলি কি রকম লম্বা ও বাঁকা, তোমরা বোধ হয় তাহা দেখিয়াছ। ফুলের ভিতরে সেই ঠোঁট্ প্রবেশ করাইয়া ইহারা মধু ও পোকা-মাকড় খায়। এই জন্য ভগবান তাহাদের ঠোঁটগুলির আকৃতি ঐ রকম করিয়াছেন। তা ছাড়া মধু চুষিয়া খাইবার জন্য জিভগুলির আকৃতি কতকটা নলের মতো থাকে। ঠোঁট দিয়া ফুলের তলায় ছিদ্র করিয়া মধুপায়ীরা মধু খাইতেছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। গাছে রঙিন্ ফুল ফুটিলে এই পাখীরা গাছের কাছ ছাড়া হইতে চায় না। আমাদের বাড়ীর আঙিনায় একটা জবা গাছ ছিল,—লাল জবা-ফুলে গাছটি বারো মাসই ভরিয়া থাকিত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেকগুলি মধুপায়ীকে গাছের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। তোমাদের ফুলবাগানে সন্ধান করিলে ইহাই দেখিতে পাইবে।

শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ জাতির মধুপায়ী আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই গায়ের পালকের রঙ্ স্বতন্ত্র। আমাদের বাংলা দেশে ইহাদের মধ্যে যে উপজাতিকে সর্ব্বদাই দেখা যায়, কেবল তাহারি কথা তোমাদিগকে বলিব। এই পাখীদের স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা এক রকম নয়। দূর হইতে

পুরুষ পাখীদের ভ্রমরের মতো সবুজে রকমের কালো বলিয়া বোধ হয় এবং ভালো করিয়া দেখিলে পেটের তলাটা ফিকে হল্‌দে রকমের দেখায়। কিন্তু ইহা তাহাদের প্রকৃত রঙ্‌ নয়। যদি এই পাখীদের ধরিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, ইহাদের মাথার উপরকার খানিকটা রঙ্‌ সবুজ এবং কখনো গোলাপি দেখাইতেছে। ঘাড় ও পিঠের খানিকটা যেন লাল। ঝাড়-লণ্ঠনের তিন-কোণা কাচে সূর্য্যের আলো পড়িয়া যেমন নানা রঙের বাহার দেখায়, মধুপায়ীদের পালকে সূর্য্যের আলোতে সেই রকমেই নানা রঙ্‌ ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পায়। তাই ইহাদের গায়ের রঙ্‌ যে কি, তাহা হঠাৎ বলা যায় না।

মধুপায়ীদের বাসা তোমরা দেখিয়াছ কি? খোঁজ করিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, বাসাগুলিতে খুব কারিগুরি আছে। ছোটো ঝোপে ইহারা বাবুইদের মতো ঝুলানো বাসা তৈয়ারি করে। বাগানের মেদির বেড়ার ভিতরে আমরা এই রকমই বাসা দেখিয়াছিলাম। শুক্‌না খড়কুটা মাকড়সার জাল দিয়া জড়াইয়া ইহারা বাসা তৈয়ারি করে। কখনো কখনো কাগজের ছোটো টুকরা ও অন্য পাখীর নরম পালকও বাসায় পাওয়া যায়। কাক চিল ও ফিঙেদের বাসার ছাদ থাকে না, কিন্তু মধুপায়ীদের বাসার ছাদ থাকে এবং ভিতরে প্রবেশ করার জন্য ছাদের কাছে এক-একটা পথও দেখা যায়। বাহির হইতে বাসাগুলিকে খড়কুটার স্তূপ বলিয়া বোধ হয়,—কিন্তু ভিতরটা বড় সুন্দর। কোথা

হইতে তূলা আনিয়া মধুপায়ীরা ভিতরে বিছাইয়া রাখে। তাই আমরা গদির উপরে শুইয়া যেমন আরাম পাই, ইহারা বাসায় শুইয়া সেই রকম আরাম পায়।

মধুপায়ীদের প্রায়ই দুইটার বেশি ডিম হয় না। ঝোপ-জঙ্গলের খুব সরু ডালের গায়ে বাসা বাঁধে বলিয়া বোধ হয় কাক-কোকিল প্রভৃতি দুষ্ট পাখীরা ডিমগুলিকে নষ্ট করিতে পারে না। তাই মধুপায়ীরা যে দুইটা করিয়া ডিম পাড়ে, তাহাদের প্রত্যেকটি হইতে ছানা হয়। গিরগিটি ও টিক্-টিকিরা মধুপায়ীদের ডিমের পরম শত্রু। সন্ধান পাইলেই ইহারা বাসায় গিয়া ডিম চুরি করিয়া খায়। এই সব ছোটো শত্রুর ভয়ে মধুপায়ীদের সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়।

কপোত-জাতি

পায়রা

তোমাদের মধ্যে হয় ত অনেকেই পায়রা পুষিয়াছ অথবা পোষা পায়রাদের দেখিয়াছ। তাই ইহাদের সম্বন্ধে বেশি কথা তোমাদিগকে বলিব না।

পায়রাদের চেহারা লক্ষ্য করিয়াছ কি? ইহাদের মাথা-গুলি অন্য পাখীদের তুলনায় যেন ছোটো। কিন্তু ডানা চিল বা শকুনদের মতো বড় না হইলেও খুব জোরালো। তাই উহারা অনেক ক্ষণ ধরিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে। পায়রাদের পায়ের আঙুলগুলির মধ্যে তিনটা আঙুল থাকে সম্মুখে, এবং একটা থাকে পিছনে। পিছনের আঙুলটি যেন ছোটো। আবার পা দুখানির রঙ্ টুকটুকে লাল। পায়রা-দের ঠোঁট্ ছোটো এবং তাহাতে জোরও কম। কাক বা চিলদের মতো উহারা ঠোঁট দিয়া কোনো জিনিস ঠুক্‌রাইয়া খাইতে পারে না।

আমাদের দেশের অনেক পাখীই চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে। তার পরে ডিম হইতে ছানা

বাহির হইলে এবং সেগুলি বড় হইলে, পাখীরা আর বাসার সহিত সম্বন্ধ রাখে না। কিন্তু পায়রারা বারো মাসই ডিম পাড়ে। তাই বারো মাসই তাহাদের বাসার আয়োজন রাখিতে হয়। পায়রাদের বাসা তোমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বা গোয়াল ঘরেই দেখিতে পাইবে। কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটুও কারিগুরি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘরের দেওয়ালের ফাঁকে কতকগুলি খড়কুটো গাদা করিলেই ইহাদের বাসা তৈয়ারি হইয়া যায়। পায়রারা এই এলো-মেলো রকমে সাজানো খড়ের উপরে ডিম পাড়ে।

পায়রা

পায়রার ডিম তোমরা দেখিয়াছ কি? সেগুলি ফুট্‌ফুটে সাদা। এই সব ডিম হইতে যে ছানা বাহির হয়, প্রথমে তাহাদের গায়ে পালক থাকে না এবং তাহাদের চোখ্‌গুলি খোলা থাকে না। কাক-কোকিলের বাচ্চারা যেমন জন্মিয়াই "খাই খাই" করিয়া চীৎকার করে, পায়রার বাচ্চারা তাহা করে না। তাই পায়রারা নিঃসহায় বাচ্চাদের অতি-যত্নে পালন করে। ধান সরিষা ঘাসের বীজ প্রভৃতিই পায়রাদের প্রধান খাদ্য। তোমরা পায়রাদের ইটের কুচি কাঁকর খাইতে দেখিয়াছ কি? ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। তোমাদের আঙিনায় যে সব মেটে গোলা-পায়রা চরিতে আসে,

তাহাদের লক্ষ্য করিয়ো, দেখিবে, তাহারা ক্রমাগত ঠোঁট নীচু করিয়া মাটি হইতে যেন কি খুঁটিয়া খাইতেছে। আমরা মনে করি, বুঝি ধান বা সরিষা খাইতেছে। কিন্তু তাহা নয়। বাড়ীর আঙিনায় সকল সময় সরিষা বা ধান পড়িয়া থাকে না। পায়রারা তখন ইঁটের কুচি ও কাঁকর কুড়াইয়া খায়। পায়রাদের পেটে যাঁতার মতো একটা অংশ আছে। অন্য খাবারের সঙ্গে কাঁকর ইত্যাদি মিশিলে যাঁতা কলে সেগুলির চাপে সব খাবার গুঁড়া হইয়া যায়। কিন্তু বাচ্চারা ধান গম কিছুই প্রথমে খাইতে পারে না। তাই পায়রারা অর্দ্ধেক হজম-করা শস্য পেট হইতে উগ্‌রাইয়া বাচ্চাদের খাওয়ায়। আমরা ছোটো বেলায় যেমন মায়ের দুধ খাইয়া বড় হই, পায়রাদের ছোটো বাচ্চারা সেই রকম মায়ের মুখ হইতে ঐ খাবার খাইয়াই বড় হয়।

মানুষের মধ্যে দুই-চার জন এমন গম্ভীর প্রকৃতির থাকে যে, তাহাদের মুখ দেখিলেই ভয় পায়। কাছে গিয়া যে দুটা কথা বলিব, তাহার ভরসা হয় না। আবার এ-রকম লোকও অনেক দেখা যায়, যাহাদের মুখে সর্ব্বদাই হাসি লাগিয়া থাকে। এ সব লোককে দেখিলেই তাহাদের সঙ্গে দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা হয়। পাখীদের মধ্যেও এই রকম গম্ভীর ও প্রফুল্ল দুই স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বক, চিল, শকুন, বাজ, পেঁচা, ইহারা সকলেই গম্ভীর প্রকৃতির পাখী। চেহারা দেখিলেই ভয় পায়। কিন্তু খঞ্জন দোয়েল চড়ুইদের

চেহারা সে-রকম নয়। ইহাদের চাল-চলনে এবং চেহারায় এমন একটা কি আছে যে, দেখিলেই মনে হয়, তাহাদের সঙ্গে মিশিলে ভয় নাই। পায়রারাও ঠিক্ সেই রকমেরই পাখী,—তাহাদের চাল-চলন ও চেহারায় যেন স্ফূর্ত্তি লাগিয়াই আছে। পুরুষ-পায়রাগুলি কেমন "বকম্ বকম্" শব্দ করিয়া গলা ফুলাইয়া স্ত্রীদের চারিদিকে নাচিয়া বেড়ায়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? ইহাদের স্ফূর্ত্তির যেন সীমা নাই।

হরিয়াল

হরিয়ালরা পায়রা জাতিরই পাখী। আকৃতিতে কতকটা মিল থাকিলেও চাল-চলনে ও গায়ের রঙে পায়রাদের সঙ্গে মিল নাই।

হরিয়াল হয় ত তোমরা সকলে দেখ নাই। ইহারা কখনই গৃহস্থদের বাড়ীতে চরিতে আসে না বা বাগানের গাছে আসিয়াও বসে না। একটু নিরিবিলি জঙ্গলের গাছে হরিয়ালদের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের দেখিতে অতি সুশ্রী। গায়ের রঙ্ যেন হল্‌দেটে সবুজ। বুক ও গলার রঙ্ কিন্তু বেশি হল্‌দে। পা দুখানি ছোটো কিন্তু তাহারো রঙ্ হল্‌দেটে লাল। এ রকম রঙের পাখী আর দেখাই যায় না। টিয়া পাখীদের রঙ্ সবুজ, কিন্তু ঠোঁট লাল। আবার অনেক জাতের টিয়ার গায়ে ও ডানায় লাল নীল এবং কালোর ছোপও থাকে। কিন্তু হরিয়ালদের গায়ে এ সব হাঙ্গামা নাই,—যেখানে যে রঙ্‌টি দিলে খাপ খায় সেই রকম রঙে যেন কোনো শিল্পী পাখীটিকে চিত্র করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু রঙের মধ্যে সবুজই প্রধান। তাই যখন

এক ঝাঁক হরিয়াল কোনো গাছে গিয়া বসে, তখন গায়ের রঙে ও পাতার রঙে এমন মিলিয়া যায় যে, একটি পাখীকেও দেখা যায় না।

হরিয়ালরা কি খায় তোমরা জানো কি? পায়রার জাতের পাখী হইলেও ইহারা ধান গম সরিষা কখনই ছোঁয় না, ইহাদের প্রধান খাবার ফল। তাই অশথ বট প্রভৃতি গাছে ইহারা আড্ডা করে। কখনো কখনো এক-একটা ঝাঁকে ইহাদের পঞ্চাশ-ষাটটা দেখা যায়। তাই যে-গাছে বসে, সে-গাছের ফল ইহারা একটাও রাখে না। সাধারণ লোকে বলে, হরিয়াল পাখীরা ভয়ানক অহঙ্কারী, তাই মাটিতে কখনই পা ফেলে না। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়, আমরা উহাদের কখনই পায়রাদের মতো মাটিতে নামিয়া চরিতে দেখি নাই। উহাদের ধান গম খুঁটিয়া খাওয়ার দরকার হয় না, তাই বোধ করি উহারা মাটিতে নামে না। অনেকে বলে, যখন পিপাসা লাগে তখন হরিয়ালরা পায়ে গাছের পাতা লইয়া নদীর ধারে বসে এবং পাছে পায়ে মাটি ঠেকে এই ভয়ে সেই পাতার উপরে পা রাখিয়া নদীর জল খায়। আমরা হরিয়ালদের এ রকমে জল খাইতে দেখি নাই। বোধ করি ইহা একটা গল্প।

হরিয়াল

পায়রাদের মতো হরিয়ালরা "বকম্ বকম্" করিয়া ডাকে না। গোলা পায়রারা যেমন মাঝে মাঝে "কু—কু" করিয়া

আস্তে আস্তে শব্দ করে, হরিয়ালরা সেই রকমে ডাকে। কিন্তু এই ডাক খুব মিষ্ট,—ঠিক্ যেন শিষ্ দেওয়ার মতো। ইহাদের বাসা কিন্তু দেখিতে একটুও ভালো নয়। কতক-গুলা খড়কুটা জড় করিয়া ইহারা গাছের উপরে বাসা বাঁধে এবং তাহাতে দুই-তিনটা করিয়া সাদা রঙের ডিম পাড়ে। কিন্তু বাসার খড়কুটা ঠিক্ মতো সাজানো থাকে না বলিয়া অনেক ডিমই বাসার ফাঁক দিয়া মাটিতে পড়িয়া ভাঙিয়া যায়।

হরিয়ালের মাংস নাকি খাইতে খুব ভালো। এই জন্য ইহাদের শত্রু অনেক। শিকারীরা দলে দলে হরিয়াল শিকার করিতে বাহির হয়,—গাছে গাছে খুঁজিয়া ইহাদের গুলি করিয়া মারে। দেখ, এই সব মানুষ কত নির্দ্দয়! এই পাখীরা পৃথিবীর কোনো ক্ষতিই করে না। বনে-জঙ্গলে পাতার আড়ালে লুকাইয়া বনের ফল খায় এবং নিজেদের ছোটো বাচ্চাদের পালন করে। কিন্তু মানুষ তাহা সহ্য করিতে পারে না; বন্দুক হাতে করিয়া ডাকাতের মতো তাহাদিগকে খুন করে। দেখ, মানুষের কত অন্যায়!

ঘুঘু

ঘুঘুরা পায়রা-জাতের পাখী। তাই তাহাদের কথা এখানেই বলিব। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে ঘুঘুদের "ঢুপি" পাখী বলিয়া ডাকে।

ভারতবর্ষে চার-পাঁচ রকমের ঘুঘু আছে। কিন্তু বাংলা-দেশে আমরা সচরাচর দুই রকমের বেশি ঘুঘু দেখি নাই। তোমরা কত রকমের ঘুঘু দেখিয়াছ?

তিলে ঘুঘু তোমরা দেখিয়াছ কি? এই ঘুঘুই কিন্তু আমরা বাগানে ঘাটে-মাঠে বেশি দেখিতে পাই। ইহাদের গায়ের রঙ্ যেন কতকটা লাল্‌চে। ঘাড়ের উপরে ও গলায় সাদা ফোঁটা আছে। লেজের পালক কতকটা কালো কিন্তু সেগুলির শেষে সাদা ছোপ লাগানো। গায়ে সাদা সাদা ফোঁটা আছে বলিয়াই বোধ করি ইহাদিগকে তিলে ঘুঘু নামে দেওয়া হইয়াছে।

তিলে ঘুঘুদের ডাক বড় মজার। "ক্রুকু—ক্রু—ক্রু—ক্রু" এই রকম শব্দ করিয়া ইহারা সকালে দুপুরে ক্রমাগত ডাকে। শুনিয়া বুঝিয়াছি, "ক্রু—ক্রু" এই শব্দটা কখনো

কখনো তাহাদের গলা হইতে সাত-আটবার পর্য্যন্ত বাহির হয়। ঠিক্ দুপুর বেলায় ঘুঘুরা যখন দূরের বাগানে ঐ রকম সুরে ডাকে, তখন যেন তাহা কান্নার মতো শুনায়।

গলার উপরে কণ্ঠী-ওয়ালা আর এক রকম ঘুঘু তোমরা খোঁজ করিলে বাগানে দেখিতে পাইবে। ইহাদের ডাকও যেন কতককটা কান্নার মতো। তিলে ঘুঘুদের মতো ইহারা "ক্রু—ক্রু" শব্দ বারবার গলা হইতে বাহির করে না, —"কু-কু-কুঃ" কেবল এই শব্দেই বার-বার ডাকে। খুব ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই ঘুঘুদের ডাকের বিরাম দেখা যায় না। আমরা কখনো কখনো ইহাদিগকে রাত্রিতেও ডাকিতে শুনিয়াছি।

ঘুঘু

এই দুই রকম ঘুঘু ছাড়া শ্যাম-ঘুঘু রাম-ঘুঘু ইত্যাদি নামের আরো ঘুঘু কখনো কখনো দেখা যায়। রাম-ঘুঘুরা জঙ্গলের পাখী। জঙ্গল ছাড়িয়া ইহারা প্রায়ই গ্রামে চরিতে আসে না; বনে থাকিয়া বনের ফলই ইহারা খায়। তা ছাড়া এক রকম লাল ঘুঘুও মাঝে মাঝে দেখা যায়। ইহাদের ডানা বেশ লম্বা ও গোলাপি রঙের। কিন্তু মাথাটা ধূসর। এই ঘুঘুরা প্রায়ই ঝাঁকে ঝাঁকে চরিয়া বেড়ায়।

ঘুঘুদের বারো মাসই ডিম হয়। তাই বাসা বাঁধিবার জন্য ইহাদিগকে বারো মাসই ব্যস্ত থাকিতে হয়। কিন্তু বাসাগুলি দেখিতে একটুও ভালো নয়। কোনো-মতে

কতকগুলা খড়কুটা একত্র করিয়া তাহার উপরে উহারা সাদা রঙের দুই-তিনটা করিয়া ডিম পাড়ে। কাক কোকিল ও হাঁড়িচাঁচাদের মতো চোর পাখী বোধ হয় খুঁজিয়াই মিলে না। ইহাদের ডাকাত বলিলেও চলে। অন্য পাখীদের বাসায় গিয়া ডিম চুরি করিয়া খাওয়া ইহাদের ভারি বদ্ অভ্যাস। ঘুঘুদের উপরেও ইহারা খুব অত্যাচার করে। তাই ঘুঘুরা কাক-কোকিলদের দু'চক্ষে দেখিতে পারে না। পাছে তাহারা ডিম চুরি করে, এই ভয়ে অস্থির থাকে। তাই বাসার কাছ দিয়া কাক বা কোকিল উড়িয়া গেলে "কোঁ—কোঁ" শব্দ করিয়া ঘুঘুরা খামকা তাহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এমন কি, চিল ও শিক্রা পাখীরাও উহাদের হাত হইতে উদ্ধার পায় না। ঘুঘুরা কাক ও চিলের পিছনে ছুটিয়া তাহাদের লেজের পালক ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি।

মানুষের হাত হইতে ঘুঘু পাখীরাও পরিত্রাণ পায় না। ঘুঘুর মাংস খাইতে ভালো, তাই শিকারীরা বন্দুকের গুলিতে ইহাদের মারে। কেহ কেহ আবার ফাঁদ পাতিয়াও ঘুঘু ধরে।

তিতির ও বটের

তিতির পাখীদের তোমরা বাগানে বা মাঠে-ঘাটে দেখিতে পাইবে না। ইহারা জঙ্গলের পাখী,—মানুষের কাছে আসিতে চায় না এবং লোকের বাড়ীতেও চরিতে আসে না। তাই এই পাখী-সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলিব না। লোকে সখ্ করিয়া তিতির পাখী খাঁচায় রাখিয়া পোষে।

আমাদের দেশে তুই জাতি তিতির দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এক জাতির নাম "গৌর তিতির।" এই তিতিরদের পালকের রঙ্ যেন কতকটা ছেয়ে। তাহারি উপরে আবার সাদা ছিটে-ফোঁটা থাকে। আর এক জাতির নাম "কালো তিতির।" ইহাদের পেট গলা বুক এবং মাথার কতকটার রঙ কালো। কিন্তু এই পাখীদের বাংলাদেশে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, তিতিররা খুব স্ফূর্ত্তিবাজ পাখী। গ্রামের কাছে জঙ্গলে কয়েকটা তিতির থাকিলে, তাহাদের উঁচু গলার শব্দে বন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু মানুষের অত্যাচারে তাহাদে সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়। তিতিরের মাংস

না কি খুব ভালো ; তাই শিকারীর দল বন্দুক হাতে করিয়া বনে যায় এবং তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

বটের পাখী তোমরা দেখিয়াছ কিনা, জানি না। ইহারা কিন্তু বারো মাস আমাদের দেশে থাকে না। শীতকালে বাংলাদেশে বটের পাখীরা চরিতে আসে। ছোটো জঙ্গলে ও ঘাসের মধ্যে বা গম ও যবের ক্ষেতে ইহারা লুকাইয়া খাবারের খোঁজ করে। মানুষের পায়ের শব্দ পাইলে তাহারা এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় লুকায়। ইহারা ভারি ভীতু পাখী। কিন্তু এত লুকোচুরি করিয়াও মানুষের হাত হইতে উদ্ধার পায় না। পায়রা জাতের অন্য পাখীদের মাংসের মতো বটেরের মাংস নাকি খাইতে খুব ভালো। তাই শিকারীরা শীতকালে খুঁজিয়া পাতিয়া উহাদের গুলি করিয়া এবং জাল পাতিয়া ধরিয়া মারে।

বটের পাখীরা আকারে শালিক পাখীদের চেয়ে বড় হয় না। ঠোঁটগুলি ছোটো এবং বেশ সরু। গায়ের পালক কতকটা খয়েরি রঙের, কিন্তু পিঠে সাদা ডোরা থাকে। তোমরা শীতকালে মাঠে বেড়াইবার সময়ে লম্বা ঘাসের ভিতর হইতে এই পাখীদের বাহিরে আসিতে দেখিবে।

ময়ূর

ময়ূর বাংলা দেশের পাখী নয়। কিন্তু ইহা ভারতবর্ষেরই পাখী। ভারতবর্ষ ছাড়া ইহাদিগকে অন্য দেশে দেখা যায় না। রাজপুতানার বন-জঙ্গলে ইহারা দলে দলে বেড়ায় এবং সেখানে বাসা করিয়া ডিম পাড়ে। এক-এক দলে পঞ্চাশ-ষাটটি করিয়া ময়ূর থাকে। যাহা হউক, ইহাদের মতো সুন্দর পাখী বোধ করি পৃথিবীতে আর নাই। ময়ূরদের তোমরা যে সুন্দর লেজ দেখিতে পাও, তাহা কেবল পুরুষ পাখীদেরই থাকে। স্ত্রী-পাখীদের লম্বা লেজ থাকে না।

তোমরা আগেই দেখিয়াছ, যে-সব পাখীর লেজ লম্বা, তাহারা লেজ নষ্ট হইবার ভয়ে মাটিতে নামিয়া চরে না। ফিঙে, কোকিল ইত্যাদি পাখী এই জন্যই গাছে গাছে বেড়াইয়া খাবারের সন্ধান করে এবং কখনো কখনো উড়ন্ত পোকামাকড় ধরিয়া খায়। ময়ূরদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। ইহারা লেজ লইয়া এত শশব্যস্ত থাকে যে, সহজে মাটিতে নামিতে চাহে না।

ময়ূরের লেজ বোধ করি তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ

দেখিয়াছ। ইহাতে যে কত রকম রঙের পালক আছে, তাহা বোধ করি তোমরা গুণিয়াই শেষ করিতে পারিবে না। পালকের শেষে যে চক্র থাকে, তাহাতেই রঙের বাহার বেশি। লাল, সবুজ, সোনালি, বেগুণে—এই রকম নানা রঙ্ মিলিয়া তাহাকে অতি সুন্দর করিয়া তোলে।

ময়ূরদের পিছনের এই রঙিন্ পালককে লেজ বলে বটে, কিন্তু ইহা সত্যই লেজ নয়। ইহাদের আসল লেজ থাকে ঐ রঙিন্ পালকের তলায়। রঙিন্ পালকগুলি লেজেরই

ময়ূর

আচ্ছাদন। সুতরাং ময়ূরের পেখমের চক্রওয়ালা পালক-গুলিকে যদি লেজের পালক বলা যায়, তবে ভুল হয়।

আমাদের এক জোড়া পোষা ময়ূর ছিল। ময়ূরীটা এমন পোষ মানিয়াছিল যে, পোষা কুকুরের মতো আমার পিছনে পিছনে চলিত; খাবার খাইবার জন্য ঘরের ভিতরে

গিয়া উৎপাত করিত; খাবার হাতে করিয়া ধরিলে হাত হইতে তাহা লইয়া খাইত। দিনে এই রকম দুষ্টামি করিয়া সে রাত্রিতে ডালে বসিয়া ঘুমাইত। তোমরা বোধ করি ময়ূরের বাসা ও ডিম দেখ নাই, আমরা এই পোষা ময়ূরীটির ডিম ও বাসা দেখিয়াছিলাম। বাগানের বাহিরে ঝোপেব তলায় শুক্‌না পাতা ও কুটোকাটা এক জায়গায় জমা করিয়া সে তাহার উপরে গোটা চার-পাঁচ সাদা ডিম প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু এই ডিম পাড়াতেই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। এক দিন সকালে দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড মরা গোখুরা সাপ ময়ূরের বাসার কাছে পড়িয়া আছে। সাপটা রাত্রিতে ময়ূরের ডিম খাইবার জন্য আসিয়াছিল,—ময়ুর তাহাকে ঠোক্‌রাইয়া মারিয়াছে। ইহার দুই-তিন দিন পরে প্রাতে দেখা গেল, ময়ূর বাসায় নাই; ডিমগুলি চারিদিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া পড়িয়া আছে। বড় ভয় হইল;—খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইলাম, একটু দূরে এক গাছের তলায় ময়ূরের পালক ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বোধ করি, শিয়ালেরা ময়ূরের সন্ধান পাইয়া রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। সেই পোষা ময়ূরের কথা আজো আমাদের মনে পড়ে।

তাহা হইলে দেখ, ময়ূরেরা গাছে গাছে বেড়াইলেও, তাহারা বাসা বাঁধে এবং ডিম পাড়ে মাটির উপরে। ময়ূরেরা কি খায়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান আমাদের সেই পোষা ময়ূরটিকে—ধান, চাল, গম, পোকামাকড়, নরম

ঘাস ও কপির পাতা খাইতে দেখিয়াছি। তাই মনে হয়, ইহারা সব জিনিসই খায়। কিন্তু জল খায় বড় বেশি। তাই জঙ্গলের ময়ূরেরা যেখানে জল আছে সেইখানেই বেশি আড্ডা করে।

ধনেশ

জ্যান্ত ধনেশ পাখী বোধ হয় তোমরা সকলে দেখ নাই। ইহারা থাকে আমাদের দেশের চট্টগ্রাম জেলার জঙ্গলে। বর্ম্মাতেও নাকি অনেক ধনেশ পাখী দেখা যায়। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা ইহাদের দেখিতে পাইবে। আমাদের দেশে যাহারা ভেল্‌কি বাজী দেখাইতে আসে, তাহাদের সঙ্গে কখনো কখনো ধনেশের ঠোঁট থাকে। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? ভয়ানক লম্বা ঠোঁট! পাখীটা যত লম্বা, ঠোঁট প্রায় সেই পরিমাণে লম্বা হইতে দেখা যায়। এত বড় লম্বা ঠোঁট লইয়া পাখীগুলা যেন সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকে। ইহা ছাড়া ঠোঁটের উপরে আবার খাঁড়ার মতো আর একটা অংশ লাগানো থাকে।

যাহা হউক, ধনেশ পাখীদের বাসা-তৈয়ারি ও সন্তান-পালন বড় মজার ব্যাপার। আমরা সেই কথাটিই তোমাদের এখানে বলিব। খড়কুটা দিয়া ইহারা বাসা বানায় না। ডিম-পাড়ার সময় হইলে ইহারা গাছের পোকা-ধরা পচা ডালে গর্ত্ত করিয়া কোটর তৈয়ারি করে। তার পরে স্ত্রী-পাখী সেই কোটরে বসিয়া কোটরের মুখ নিজের বিষ্ঠা দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, সে কোটরে বন্দী হইয়া না খাইয়াই দিন কাটায়। কিন্তু তাহা নয়,—

ইহারা গর্তে খুব ছোটো একটু ছিদ্র রাখে। পুরুষ-পাখী বাহির হইতে পোকামাকড় ফল প্রভৃতি খাবার সেই ছিদ্র-পথের ভিতরে চালান করে, স্ত্রী-পাখী তাহা খাইয়া পেট ভরায়। এই-রকমে অন্ধকার কোটরে বদ্ধ থাকিয়া স্ত্রী-পাখী ডিম পাড়ে এবং ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইলে সে-গুলিকে পালন করে। বেচারী পুরুষ-পাখী বাহিরে থাকিয়া এক-মাস দেড়-মাস ধরিয়া কেবল খাবার জোগাইতেই থাকে। তখন নিজের খাবারের দিকে তাহার নজর থাকে না। এই রকমে পুরুষ-পাখীরা না খাইয়া মারাও পড়ে। ওদিকে স্ত্রী-পাখীরা ভাল-মন্দ খাবার খাইয়া মোটা হইয়া বাসা হইতে বাহির হয়।

ধনেশ

বোর্ণিয়ো দ্বীপে নাকি অনেক ধনেশ পাখী আছে। সেখানকার লোকে এই পাখীদের উপরে ভারি অত্যাচার করে। বড় বড় পাখী ধরিয়া তাহারা উহাদের পালক ছিঁড়িয়া মাথায় পরে এবং ডিম ও বাচ্চাগুলিকে খুঁজিয়া-পাতিয়া খাইয়া ফেলে। এই রকম উপদ্রবে এখন ধনেশ পাখীর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। দেখ, মানুষগুলো কত দুষ্ট। গ্রাম ও নগর ছাড়িয়া যাহারা গভীর জঙ্গলে গিয়া বাস করে, ইহারা তাহাদিগকেও খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাহাদের পালক ছিঁড়িয়া ও ছানা কাড়িয়া লইয়া কষ্ট দেয়।

শিকারী-পাখী

চিল

শিকারী-পাখীদেব কথা বলিতে গেলে চিলের কথাই আগে মনে পড়িয়া যায়। ইহাদের চেহারা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। সাধারণ চিলেরা কখনো কখনো এক হাতের চেয়েও বেশি লম্বা হয়। আবার স্ত্রী-চিলদের পুরুষদের চেয়ে যেন আকারে বড় দেখায়। তোমরা বোধ করি চিলের গায়ের পালকের রঙ্ ভালো করিয়া লক্ষ্য কর নাই। রঙ্ খুব চক্‌চকে এবং জম্‌কালো নয়,—অথচ দেখিতে মন্দ লাগে না। দূর হইতে চিলকে দেখিলে মনে হয় যেন তাহার গায়ের রঙ্ খয়েরি। কিন্তু গায়ের পালকের সব জায়গারই রঙ্ একই রকমের খয়েরি নয়।

শিকারী পাখী

চিলদের উড়া তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? কাক শালিক পায়রারা যেমন ডানা নাড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়, ইহারা প্রায়ই সে রকমে উড়ে না। ডানা দুখানিকে মেলাইয়া স্থির রাখিয়া উড়াই ইহাদের স্বভাব। তা' ছাড়া উড়িবার ভঙ্গিটাও বড় সুন্দর। চিলেরা যখন কোনো শিকারের উপরে ছোঁ মারিতে যায়, তখন ডানা স্থির রাখিয়া প্রায়ই আকাশে চক্রাকারে কয়েকবার ঘুরপাক দেয়, তারপর ফস্ করিয়া শিকারের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

শিকারী-পাখীদের চোখের জোর খুব বেশি। মাঠে একটা ছোটো ইঁদুর চলিয়া বেড়াইলেও তাহা ইহারা তিন চারি হাজার ফুট উপরে উড়িয়াও দেখিতে পায়। চিলেরা এই রকমে অনেক উপরে উড়িতে উড়িতে মাঠে-ঘাটে কোথায় কোন্ খাবার আছে তাহা দেখিয়া লইয়া ছোঁ মারে। কিন্তু দেখিয়ো, চিলেরা ঠোঁটে করিয়া কোনো খাবারের জিনিস ধরে না। ছোঁ মারিয়া পায়ের ধারালো নখ দিয়া খাবার ধরে; তার পরে তাহা কোনো গাছের মাথায় লইয়া গিয়া সেই বাঁকানো ও ধারালো ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িয়া খায়। পায়ে খাবার রাখিয়া উড়িয়া চলে বলিয়া অনেক সময় কাকের দল উহা কাড়িয়া লইবার জন্য চিলের পিছনে পিছনে ছুটিতেছে, এবং শেষে তাহা কাড়িয়া লইয়াছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। ঠোঁটে খাবার রাখিলে বোধ করি কাকেরা এই রকম ফাঁকি দিয়া খাবার কাড়িতে পারিত না।

চিলের ডাক তোমরা শুনিয়াছ কি? ইহারা "চি—ই—ই—ল, হি—হি—হি" এই রকম একটা মিহি সুর গলা হইতে বাহির করিয়া চীৎকার করে। আবার ছানারা ডাকে বিড়ালের মতো "মিউ—মিউ" শব্দে। চিলেরা গৃহস্থ বাড়ীতে প্রায়ই চরিতে আসে না। বাড়ীতে কোনো ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে জানিলেই কাকদের মতো দুই-চারিটি চিলকেও ছাদের উপরে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তার পরে সুবিধা পাইলেই, তাহারা ছোঁ মারিয়া কিছু খাবার জিনিস পায়ে লইয়া দূরে পালাইয়া যায়। ইহাদের জ্বালায় বাজার হইতে মাছ বা অন্য খাবার কিনিয়া আনা দায় হয়। মাছ ও মাংস ছাড়া অন্য জিনিস ইহারা খাইতে ভালবাসে না,—তথাপি যে-কোনো খাবারের জিনিস দেখিলেই তাহাতে ছোঁ মারে এবং তার পরে গাছে লইয়া গিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। স্বর্ণকার সোনার গয়না গড়িয়া লইয়া যাইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে চিল আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

চিল

চিলেরা গাছের উঁচু ডালে বর্ষার শেষে শুক্‌না ডালপালা দিয়া বাসা তৈয়ারি করে। ইহাদের বৎসরে দুইবার করিয়া ডিম হয়। এই জন্য বর্ষার শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ইহারা বাসার তদ্বির করে। চিলের ডিম বড় সুন্দর।

ডিমগুলি দেখিতে সাদা, কিন্তু সেই সাদার উপরে যে খয়েরি ছোপ থাকে, তাহাই দেখিতে সুন্দর।

আমরা ছেলেবেলায় গল্প শুনিতাম, চিলেরা নাকি বর্ষাকালে বাংলাদেশ ছাড়িয়া পালায়। আমাদের এক বুড়ী দাসী বলিত, বর্ষাকালে তাহারা লঙ্কা দ্বীপে যায় এবং সেখানে রাবণের যে চিতা আজো জ্বলিতেছে, তাহাতে খড়কুটা জোগায়। কিন্তু এ সব কথা ঠিক্ নয়। বর্ষাকালে চিলেরা দেশ ছাড়িয়া পালায় না। বোধ করি, ঐ সময়ে বাসা বাঁধা ও ডিমে তা দেওয়ার জন্য খুব ব্যস্ত থাকে বলিয়া উহাদের বেশি দেখা যায় না।

শঙ্খচিল

শঙ্খচিল তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহাদের পেটের তলা বুক মাথা ও ঘাড় সাদা পালকে ঢাকা থাকে। শঙ্খের মতো সাদা পালক গায়ে আছে বলিয়াই বোধ করি ইহাদের নাম শঙ্খচিল হইয়াছে। কিন্তু ডানা দু'খানি এবং শরীরের অন্য অংশ খয়েরি।

এই চিলেরা সাধারণ চিলদের মতো দুষ্ট ও পেটুক নয়; মাংস মাছ বা অন্য খাবার জিনিস দেখিলে হঠাৎ ছোঁ মারে না। এই কারণে শঙ্খচিলদেরই লোকে ভদ্র বলে। ছেলেবেলায় এই চিল দেখিলেই আমরা চিলের মতো চীৎকার করিয়া বলিতাম,—

"শঙ্খচিলের ঘটি-বাটি
গোদা চিলের মুখে লাথি।"

সত্যই সাধারণ গোদা চিলেরা ছোঁ মারিয়া খাবার কাড়িতে গিয়া যখন হাত রক্তাক্ত করে, তখন সত্যই তাহার মুখে লাথি মারিতে ইচ্ছা হয়। শঙ্খচিলেরা গ্রামের মধ্যে আসিয়া বা গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া এ রকমে প্রায়ই ডাকাতি করে

না। মাছই ইহাদের প্রধান খাবার। তাই শীতকালে যখন খাল বিল ও পুকুরের জল শুকাইয়া যায়, তখনি ইহাদিগকে জলাশয়ের ধারে গাছে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। তার পরে গরম পড়িলে শঙ্খচিলদের প্রায়ই আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

মাঠ-চিল

যে দুই-রকম চিলের কথা বলা হইল, তাহা ছাড়া মাঠ-চিল নামে আর এক রকম শিকারী-পাখী আমাদের দেশে দেখা যায়। ইহাদের আর এক নাম "পানিডোবি"। যাহা হউক এই পাখীদের তোমরা গ্রামের মধ্যে বা গৃহস্থের বাড়ীতে দেখিতে পাইবে না। জলা জায়গায় ও মাঠে-ঘাটে ইহারা চরিয়া বেড়ায়। আবার বারো মাস ইহাদিগকে আমাদের দেশে দেখা যায় না,—শীতকালে ইহারা বাংলা দেশে চরিতে আসে। তাই তোমরা শীতকালে মাঠে বেড়াইতে গেলে হয় ত ইহাদের দুই-একটাকে দেখিতে পাইবে। মাঠ-চিলদের ডানা খুব লম্বা এবং তাহার রঙ্ অতকটা ধূসর রকমের। লেজগুলিও কম লম্বা নয়। ঠোঁটগুলি শিকারী পাখীদের ঠোঁটের মতো বাঁকা কিন্তু চাপা।

সাধারণ চিলদের মতো মাঠ-চিলেরা খুব উঁচুতে উড়ে না। খোলা মাঠের মধ্যে বা শস্যের ক্ষেতের এক হাত উপর দিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং ছোটো পোকা-মাকড় টিকটিকি গিরগিটি ইঁদুর যাহা চোখে পড়ে, সেগুলিকে ধরিয়া খায়।

ছোটো পাখীদের ইহারা ভয়ানক শত্রু। তাই এই সব পাখী মাঠ-চিলদের ভয়ানক ভয় করিয়া চলে। মনে কর, একদল ভুরুই বা শালিক ক্ষেতে বসিয়া এক মনে জোয়ার খাইতেছে। এমন সময় যদি একটি মাঠ-চিল দূরে দেখা যায়, তাহা হইলে পাখীর দলে হট্টগোল বাধিয়া যায়, সকলেই ক্ষেতের গাছের ভিতরে লুকাইয়া পড়ে; ঐ ডাকাত পাখী চলিয়া না গেলে তাহারা আর বাহিরে আসে না। শিকারীদের হাতে বন্দুক দেখিলে কাক ও অন্য পাখীরা ভয় পায়। কিন্তু মাঠ-চিলেরা শিকারীদের ভয় করে না। অনেক সময়ে ইহারা শিকারীদের কাছে কাছে উড়িয়া বেড়ায় এবং বন্দুকের গুলিতে ঘুঘু বা অন্য পাখী মারা পড়িলে, তাহা ছোঁ মারিয়া লইয়া পালাইয়া যায়।

শিক্‌রা

শিক্‌রা পাখীর নাম বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। ইহাদের প্রায়ই বাংলা দেশে দেখা যায়। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এই শিকারী পাখীদের যত বেশী দেখিয়াছি, অন্যত্র সে-রকম দেখি নাই।

শিক্‌রা পাখীরা আকারে পায়রার চেয়ে বড় হয় না। ইহাদের গায়ের পালকের রঙ্ ছেয়ে এবং বুক পেয়ালা, কিন্তু ডানা ও লেজে কালো ডোরা থাকে। আবার পেয়ালা রঙের বুকের উপরে সাদা ডোরাডুরিও দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের বাঁকানো ঠোঁট্, হল্‌দে চোখ্ এবং ধারালো নখ দেখিলে যেন ভয় লাগে। শিক্‌রাদের চাহুনিও বড় কট্‌মটে। শরীরের তুলনায় ইহাদের লেজগুলিকে যেন বেশি লম্বা বলিয়া বোধ হয়।

শিক্‌রারা কোন্ কোন্ জন্তু শিকার করে, তাহা বোধ করি তোমরা জানো না। চড়াই ভুরুইয়ের মতো ছোটো পাখী হইতে আরম্ভ করিয়া টিক্‌টিকি, গির্‌গিটি, বিছে, ব্যাঙ্ এমন কি ফড়িং পর্য্যন্ত সকল প্রাণীকেই ইহারা সুবিধা পাইলে ধরিয়া খায়। আমরা ইহাদিগকে ঘুঘু ও শালিক ধরিয়া

খাইতে দেখিয়াছি। বোধ করি, ঘুঘুদের চেয়ে বড় পাখীদের ইহারা শিকার করিতে পারে না। প্রত্যেক শিকারী পাখীর শিকার করার এক-একটা রীতি আছে। ইহার কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। ফিঙে, বাঁশপাতি, তালচোঁচ, আবাবিল, —এই সব পাখীরা উড়িয়া উড়িয়া উড়ন্ত পোকামাকড় ধরিয়া খায়; কাঠ্ঠোক্‌রারা গাছে চাপিয়া পোকা বাহির করিয়া জিভে আট্‌কাইয়া সেগুলিকে খাইয়া ফেলে; চিলেরা ছোঁ মারিয়া পায়ে করিয়া শিকার ধরে। শিক্‌রা পাখীদেরও শিকার ধরার এই রকম একটা রীতি আছে। শুনিয়াছি, সিংহেরা শিকার কাছে পাইলে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটা লাফ দেয়। এক লাফে যদি সে শিকার ধরিতে না পারে, তবে আর তাহাকে ধরিবার জন্য দ্বিতীয়বার লাফ দেয় না। শিক্‌রাদের শিকার করা কতকটা এই রকমেরই—দূরে ছোটো পাখী বা অন্য কোনো প্রাণী দেখিলে তাহারা জোরে শিকার ধরিবার জন্য উড়িয়া চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি শিকার পালাইয়া যায়, তবে আর তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে না। শিক্‌রাদের শিকার করা মজার ব্যাপার নয় কি? পোষা শিক্‌রা পাখী দিয়া আমরা সাঁওতালদের ঘুঘু শালিক চড়াই, কাঠ্‌বিড়ালি প্রভৃতি শিকার করিতে দেখিয়াছি। যেমন কুকুর দিয়া খরগোস ইত্যাদি শিকার করা হয়, শিক্‌রা দিয়া পাখী শিকার কতকটা যেন সেই রকমই। সাঁওতালেরা শিক্‌রা পাখীর পায়ে দড়ি বাঁধিয়া হাতের উপরে

বসাইয়া শিকারে বাহির হয়। তার পরে গাছে কোনো পাখীকে বসিয়া থাকিতে দেখিলেই, শিক্রাকে সেই দিকে ছাড়িয়া দেয়। শিক্রা ছুটিয়া সেই পাখীকে ধরিয়া আনে। আগেকার রাজা-রাজ্ড়া ও বাদ্শারা এই রকমেই শিক্রা ও বাজপাখী দিয়া অন্য পাখী শিকার করিতেন।

শিক্রা পাখীরা গাছের খুব উঁচু ডাল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাসা বাঁধে। শালিক চড়াই প্রভৃতি পাখীরা বাসা বাঁধার সময়ে যে কত ব্যস্ত থাকে, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ; তখন তাহাদের খড়কুটা জোগাড় করিতে আহার-নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু শিক্রা পাখীদের বাসা বাঁধার জন্য সে-রকম তাগিদ দেখা যায় না। দিনে দু'টা বা চারিটা খড় যদি গাছের উপরে আনিয়া রাখিতে পারে, যথেষ্ট। এই রকমে এক মাসে তাহাদের বাসা তৈয়ারি হয়। কিন্তু বাসার শ্রীছাঁদ একটুও দেখা যায় না ; এলোমেলো করিয়া সাজানো কতক-গুলা খড়কুটাই শিক্রাদের বাসা। এই রকম বাসায় তাহারা দুই তিনটি করিয়া ফুট্ফুটে সাদা রঙের ডিম পাড়ে। পুরাণের গল্পে শুনিয়াছি, গরুড় জন্মিয়াই "খাই—খাই" করিয়া খাবারের সন্ধানে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাকে বড় বড় বীরেরাও ধরিয়া রাখিতে পারিত না। শিক্রার বাচ্চাদের গরুড়েরই মতো সাহস দেখা যায়। তাহারা নিঃসহায়ভাবে বাসায় থাকে না। অন্য পাখীরা বাসার কাছে আসিলে ঐ ছোটো বয়সেই তাহারা শত্রুদের আক্রমণ করে।

বাজ পাখী

বাজ

বাজ পাখী সর্ব্বদা আমাদের গ্রামের মাঠে-ঘাটে দেখা যায় না। আমরা যেমন ডাকাতকে ভয় করি, অন্য পাখীরা বাজকে ঠিক্ সেই রকমেই ভয় করিয়া চলে। অনেকে শিক্রা পাখীকেই বাজ বলে। কিন্তু তাহা নয়। বাজের ডানা লম্বা এবং চোখগুলি কালো,—তাহারা শিক্রার মতো এক ছুটে পাখী ধরে না। বাজেরা পায়রাকে ধরিবার জন্য তাহার পিছনে পিছনে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। তোমরা এই সব লক্ষণ দেখিয়া কোন্ শিকারী পাখীদের আমরা বাজ বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবে। আমাদের দেশে তিলে-বাজ, সা-বাজ প্রভৃতি নানাজাতির বাজ পাখী দেখা যায়। তিলে-বাজেরা প্রায়ই জলের ধারে গাছে বসিয়া থাকে এবং অন্য খাবার না পাইলে ব্যাঙ্ ধরিয়া খায়। ইহারা সাপ ধরিয়া খাইয়াছে, একথাও শুনিয়াছি। এই বাজদের পেট ও বুক সাদা পালকে ঢাকা, কিন্তু তাহার উপরে আবার ছিঁটে-ফোঁটা দেখা যায়। বোধ হয়, এইজন্যই ইহাদের তিলে-বাজ নাম দেওয়া হইয়াছে। বাজপাখীরা যে ডিম পাড়ে, তাহা শিক্রাদের ডিমের মতো ফুট্ফুটে সাদা নয়,—সাদার উপরে অনেক ছিটা-ফোঁটা দেখা যায়।

কোড়ল

কোড়ল পাখীদের হয় ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিয়া থাকিবে। ইহারাও শিকারী পাখী। ইহাদের কপালের দিক্‌টার এবং গলা ও গালের পালক সাদা। লেজের পালকেও সাদা ডোরা আছে। শরীরের অন্য স্থানের পালকের রঙ্‌ কালো খয়েরি। আবার ঠোঁটগুলি বেশ মোটা এবং তাহার আগা বাঁকানো। কিন্তু ইহাদের ভালো করিয়া চেনা যায় গলার স্বর শুনিয়া। ইহারা বিশ্রীস্বরে চীৎকার করে—সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই চীৎকারের বিরাম থাকে না। কিন্তু কেন যে এত চীৎকার করে, তাহা বুঝাই যায় না। পাখীগুলা লম্বায় দেড় হাত পর্য্যন্ত হয়। ডানাও খুব লম্বা দেখা যায়।

কোড়ল পাখীরা গ্রামের ভিতরে প্রায়ই চরিতে আসে না। নদী খাল বা বিলের ধারেই ইহাদের আড্ডা। সেখানে থাকিয়া মাছ ধরিয়া খায়। যখন মাছ জোটে না, তখন ইহারাও ব্যাঙ্‌ পর্য্যন্ত আহার করে। আবার চুরি ডাকাতি বিদ্যাও ইহাদের বেশ জানা আছে। মনে কর, একটা চিল

বহু কষ্টে একটা ইঁদুর ধরিয়া গাছের উপরে রাখিতে যাইতেছে। কোড়ল পাখী যদি ইহা দেখিতে পায়, তবে ছোঁ মারিয়া চিলের শিকার কাড়িয়া লইয়া পালায়। চিলেরা কোড়লদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতিতে পারে না। শিকারীরা বুনো হাঁস প্রভৃতি গুলি করিয়া মারিয়াছে, কোথা হইতে কোড়ল পাখী আসিয়া মরা হাঁস চুরি করিয়া লইয়া পালাইল,—ইহাই অনেক দেখা যায়। কোড়ল পাখীরা অগ্রহায়ণ মাসে বাসা বাঁধিবার জোগাড় করে, পৌষ মাসে ইহাদের ডিম ও বাচ্চা হয়।

বাজ ও চিল জাতির অনেক সাধারণ পাখীর কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি ছাড়া সাপমারী, মাছমারী, বৈরী প্রভৃতি আরো কয়েক রকম শিকারী পাখী সময়ে সময়ে আমাদের দেশে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা বনে-জঙ্গলে বেড়ায়, সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। তাই আমরা তাহাদের কথা এখানে বলিলাম না।

শকুন

শকুনেরা মাংস খায়, কিন্তু প্রায়ই শিকার করিয়া মাংস খায় না। যে-সব মরা গরু ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাদেরি পচা মাংস ইহারা ছিঁড়িয়া খাইতে ভালবাসে। কাজেই, শকুনদের ঠিক শিকারী পাখী বলা চলে না। যাহা হউক, শকুনরা আমাদের কম উপকার করে না। গ্রামে যত গরু ঘোড়া কুকুর বিড়াল মারা যায়, সেগুলি যদি মাঠে থাকিয়া পচিত, তাহা হইলে বোধ করি দুর্গন্ধে দেশে থাকা দায় হইত। চিল, শকুন ও কাকদের মতো পাখীরা এবং শেয়াল-কুকুরদের মত জানোয়ারেরা মরা জন্তুদের খাইয়া ফেলে বলিয়াই, সেগুলি মাঠে-ঘাটে পচিতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণত দু'রকমের শকুন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ শকুন বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহারা প্রকাণ্ড পাখী। যখন আকাশের অনেক উপরে উড়িয়া বেড়ায় তখন কিন্তু ইহাদিগকে খুবই ছোটো মনে হয়। কাছে হইতে দেখিলেই ইহাদের ঠিক্ চেহারা

া যায়। ভাগাড়ের কাছে গাছের উপরে বসিয়া শকুনরা যখন রোদ পোহাইবে, তখন তোমরা ইহাদের চেহারা দেখিয়া লইয়ো।

সাধারণ শকুনদের মাথায় ও ঘাড়ে পালকের নাম-গন্ধ থাকে না। বোধ করি, মরা গরু ও ঘোড়ার পেটের ভিতরে মাথা প্রবেশ করাইয়া নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে হয় বলিয়াই ইহাদের মাথা নেড়া। গায়ের পালকের রঙ্ কতকটা গাঢ় ছাই রঙের,—পিছন দিক্‌টা কিন্তু সাদা। তা' ছাড়া ডানার ভিতরেও সাদা পালক আছে। তাই যখন শকুনরা অল্প উঁচুতে উড়ে, তখন ডানার তলা সাদা দেখায়। খুব উঁচুতে উঠিলে এই সাদা রঙ্ আর নজরে পড়ে না। যাহা হউক, শকুনরা কিন্তু ভারী নোংরা পাখী। গায়ের দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। পচা মাংস খায় বলিয়াই বোধ করি এত দুর্গন্ধ। কাক ও চিলেরা নোংরা জিনিস খায় বটে, কিন্তু প্রত্যহ স্নান করে। শকুনরা স্নানের জন্য জলের কাছে যায় না। অথচ ডানা মেলিয়া রোদ্ পোহান রাছে। তোমরা ইহাদের ডানা মেলিয়া রোদ্ পোহাইতে দেখ নাই কি? আমাদের বাগানের তাল-গাছের মাথায় কয়েকটা শকুন থাকিত। তাহারা ভোর বেলা হইতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত ডানা খুলিয়া রোদ্ পোহাইত। তার পরে আকাশের খুব উপরে উঠিয়া

শকুন

কোন্ ভাগাড়ে মরা গরু পড়িয়া আছে, তাহার সন্ধান করিতে। শকুনদের চোখের তেজ খুব বেশি। এই জন্যই খুব দূর হইতে কোথায় কোন্ মরা জন্তু পড়িয়া আছে, তাহা দেখিতে পায়। তাহাদের ডানার জোর এত বেশি যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে উড়িয়াও ইহারা ক্লান্ত হয় না। কখনো কখনো শকুনরা মাটি হইতে তিন-চারি হাজার ফুট উপরে উঠে।

ভাগাড়ে গরু মরিলে শকুনের মাথায় টনক নড়ে,—এই রকম একটা কথা আছে। কিন্তু তাহা ঠিক্ কথা নয়। দূরে কোন জন্তু মরিলে, ইহারা চোখ দিয়াই দেখিতে পায়। তার পরে প্রথমে একটা বা দু'টা শোঁ-শোঁ করিয়া সেই মরা জন্তুর কাছে আসিয়া বসে এবং ইহাদের দেখাদেখি আরো অনেক শকুন এক জায়গায় জমা হয়। আধ-মরা গরু বাছুরকে শকুনরা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি।

গিন্নি-শকুন তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি শকুনেরই এক উপজাতি,—কিন্তু চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সাধারণ শকুনদের চেয়ে দেখিতে বিশ্রী। ইহাদের গায়ের অধিকাংশ পালকের রঙ্ গাঢ় খয়েরি। কিন্তু পায়ে যেন কিছু কিছু সাদা পালক আছে। নেড়া মাথার চাম্ড়ার রঙ্ আবার লাল। মাথার দুই পাশে আবার কানের মতো দুইটা লাল অংশ ঝুলিতে থাকে। এ সব মিলিয়া গিন্নি-শকুনদের ভারী বিশ্রী দেখায়। ভাগাড়ে মরা গরু ফেলিয়া দিলে যেমন

সাধারণ শকুনরা চারিদিক হইতে হুস্ হুস শব্দে আসিয়া হাজির হয় ইহারা সে-রকম দল বাঁধিয়া চলা-ফেরা করে না। আমরা ইহাদিগকে গো-ভাগাড়ে একটা বা দুটির বেশি আসিতে দেখি নাই। যাহা হউক, কাক চিল কুকুর শিয়াল সকলেই গিন্নি-শকুনদের খুব মান্য করিয়া চলে। ভাগাড়ে কাক চিল শকুন শিয়াল ও কুকুরে মিলিয়া খুব খানা চালাইতেছে,—মাঝে মাঝে সাধারণ শকুনরা "চ্যাঁ-চ্যাঁ" শব্দ করিয়া কুকুর-শিয়ালদের তাড়াইয়া মাংস ছিঁড়িয়া পেটে পূরিতেছে,—এমন সময় যদি একটা গিন্নি-শকুন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সব আনন্দ-কোলাহল ঝগড়া-ঝাঁটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন কুকুর লেজ গুটাইয়া দূরে গিয়া বসে, শকুনরা ডানা মেলিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভাগাড়ের ছোটো বট-গাছটির উপরে আশ্রয় লয়। এ দিকে গিন্নি-শকুন পেট ভরিয়া আহার করিতে থাকে। অন্য সকলে কেন গিন্নি-শকুনদের এত মান্য করে, তাহা জানি না।

এই দুই রকম শকুন ছাড়া আমাদের দেশে কখনো কখনো এক রকম সাদা শকুন দেখা যায়। এগুলি বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ইহারা আকারে চিলের চেয়ে বেশি বড় হয় না। কিন্তু চেহারা ভারি বিশ্রী! পালকের রঙ্ এক রকম ময়লাটে সাদা, ঠোঁট, মুখ, পায়ের রঙ্ হলদে। পায়খানার ময়লা ইহাদের প্রধান আহার। তাই যেখানে ময়লা পোঁতা হয় সেখানে ইহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা

যায়। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের ময়লা খাইবার জন্য এই শকুনরা দলে দলে বেড়ায়।

শকুনের বাসা বোধ করি তোমরা সকলে দেখ নাই। গাছের খুব উঁচু ডালে ইহারা শুক্‌না ডাল-পালা দিয়া শীত-কালে বাসা বাঁধে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, কাক শালিক-দের মতো ইহারা বাসার জন্য গাছের তলা হইতে শুক্‌না কাটা-কুটা কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহারা তাহা করে না। সেই বাঁকানো এবং চেপ্‌টা ঠোঁট দিয়া ইহারা পাতা সমেত গাছের কাঁচা ডাল ভাঙ্গিয়া বাসা তৈয়ারি করে। যখন ইহারা ডানা মেলিয়া গাছের কাঁচা ডাল ভাঙে, তখন তাহাদের চেহারাগুলি দেখিলে হাসি পায়।

বাসা তৈয়ারির সময়ে শকুনদের মেজাজও ভয়ানক চটা রকমের হয়। এই সময়ে তাহারা প্রায়ই পরস্পর মারামারি ও কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করে। তোমাদের বাড়ীর কাছে তাল-গাছে যদি শকুনের আড্ডা থাকে, তবে বাসা তৈয়ারি ও ডিম পাড়ার সময়ে ইহাদের চীৎকার শুনিতে পাইবে। শকুনরা প্রায়ই বাসায় একটার বেশি ডিম পাড়ে না। কিন্তু সেই একটাতেই বাচ্চা হয়। অন্য পাখীরা ভয়ে শকুনের বাসায় উৎপাত করে না। উহাদের নোংরামি ও গায়ের দুর্গন্ধের জন্য মানুষেও বাসার কাছে ঘেঁসে না। তাই শকুনদের ডিম প্রায়ই নষ্ট হয় না। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, যে-সব পাখীর ডিম বেশি নষ্ট হয়, কেবল তাহারাই বেশি ডিম পাড়ে।

পেঁচা

তোমরা কত রকম পেঁচা দেখিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু লক্ষ্মী পেঁচা, কোটরে পেঁচা, কাল পেঁচা প্রভৃতি অনেক রকম পেঁচা দেখিয়াছি।

পেঁচারা শিকারী পাখী। রাত্রিতে শিকারে বাহির হইয়া ইঁদুর ব্যাঙ্, পাখীদের ছানা ও ডিম চুরি করিয়া খাইয়া পেট ভরায়। পোকামাকড়ও ইহারা পছন্দ করে। যখন বড় শিকার না জোটে, তখন ছোটো-বড় পোকা খাইয়াই তাহাদের পেট ভরাইতে হয়।

পেঁচাদের দিনের বেলায় প্রায়ই দেখা যায় না। কেহ গাছের কোটরে, কেহ পোড়ো ভাঙা বাড়ীর ভিতরে, কেহ বা বাড়ীর বারান্দার কার্ণিশের উপরে লুকাইয়া দিন কাটায়। তারপরে সন্ধ্যা হইলে সেই সব জায়গা হইতে বাহির হইয়া শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে আরম্ভ করে। পায়রারা যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের ডানায় কি-রকম চটা-পট্ শব্দ হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তা' ছাড়া অন্য পাখীরাও উড়িবার সময়ে শব্দ করে। কিন্তু পেচাঁরা যখন

উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের ডানার একটুও শব্দ হয় না। তাই চোরের মতো নিঃশব্দে গিয়া ইহারা পাখীদের ডিম ও ছানা চুরি করিয়া খাইতে পারে। এই রকমে চুরি করার জন্য পেঁচাদের উপরে সব পাখীরই ভয়ানক রাগ। তাই দিনের বেলায় তাহারা বাহিরে আসে না। যদি হঠাৎ বাহিরে আসে, তাহা হইলে কাক, কোকিল, ফিঙে সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করে।

লক্ষ্মী পেঁচা তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারা নিতান্ত ছোটো পাখী নয়। মুখগুলি যেন চাকার মতো গোল, কিন্তু শরীরটা অন্য পেঁচাদের তুলনায় যেন একটু লম্বা। রঙ্‌ লালচে কিন্তু মুখগুলি সাদা; গায়ে আবার সাদা ডোরা থাকে। পোড়ো বাড়ী ও নিরিবিলি জায়গায় লুকাইয়া ইহারা দিন কাটায়। বোধ করি, দিনের আলো ইহাদের চোখে ভাল লাগে না। অনেক দিন আগে আমাদের ভাঁড়ার ঘরের পাশে এক জোড়া লক্ষ্মী পেঁচা ছিল। একটু কাছে গেলেই তাহারা "ফোঁস্ ফোঁস্" করিয়া শব্দ করিত; মুখভঙ্গী করিয়া এবং চোখ পাকাইয়া ভয় দেখাইত। আমরা ভয়ে পালাইয়া যাইতাম। দিনের বেলায় বিরক্ত করিলে লক্ষ্মী পেঁচারা এই রকমেই ভয় দেখায়। আবার কখনো এক রকম "ফোঁস্-ফাঁস্" শব্দ করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তাও বলে।

পেঁচা

গৃহস্থেরা বলে, লক্ষ্মী পেঁচা ঘরে থাকিলে লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে। তাই বাড়ীতে আশ্রয় লইলে কেহই এই পাখীদের তাড়াইতে চায় না। কিন্তু ইহারা যখন রাত্রিতে চীৎকার করে, তখন ভারী রাগ হয়।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ অনেকগুলি পেঁচা এক সঙ্গে "কিচ্-কিচ্" করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ইহা প্রায়ই শুনা যায়। এই ডাকে অনেক সময় ঘুমও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাই কোটরে পেঁচার ডাক। ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে বাসা হইতে বাহির হইয়াই ইহারা দুই-চারিটায় মিলিয়া এক চোট্ ডাকিয়া লয়। তার পরে শিয়ালেরা যেমন মাঝে মাঝে এক সঙ্গে চীৎকার করে, ইহারাও সেই রকমে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে। কেন যে এই রকম চীৎকার করিয়া লোক-জনের ঘুম ভাঙায়, তাহা উহারাই জানে। যাহা হউক, রাত্রিতে পেঁচাদের এই রকম ডাক ভারি খারাপ লাগে।

কোটরে পেঁচারা আকারে লক্ষ্মী পেঁচার চেয়ে অনেক ছোটো। ইহাদের বুকের তলার অনেক পালক সাদা কিন্তু শরীরের উপরকার রঙ্ মেটে-লাল,—তার উপরে সাদা ফোঁটা ও ডোরাও থাকে। গাছের কোটরে বা বাড়ীর বারান্দার কার্ণিসের উপরে ইহাদিগকে প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। দিনে বাহির হইয়া গাছের পাতার আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

কাল-পেঁচা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। ইহারা ভারি বিশ্রী পাখী। গভীর রাত্রিতে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, তখন বাগানের গাছে বসিয়া এক মিনিট বা আধ মিনিট অন্তর ইহারা "কুঃ-কুঃ" শব্দ করে। এই শব্দ ভয়ানক বিশ্রী শুনায়। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা বট-গাছে প্রত্যেক রাত্রিতেই একটা কাল-পেঁচা ঐ রকমে ডাকিত। এই শব্দ শুনিয়া, কেন জানি না, বড় ভয় হইত। এক রাত্রিতে লাঠি হাতে করিয়া পাখীটাকে তাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি, কাল-পেঁচাদের দেখিতে কতকটা কোটরে পেঁচাদেরই মতো। কেবল ইহাদের দুই কানের কাছে, দুই গোছা পালক উঁচু হইয়া থাকে। তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন কাল-পেঁচাদের মাথায় শিং আছে। যাহা হউক ইহারা ভারি ভীরু পাখী, তাই দিনের বেলায় প্রায়ই বাহির হয় না,—রাত্রিতেও অতি সাবধানে চরিয়া বেড়ায়।

হুতুম-পেঁচাদেরও সচরাচর দেখা বড় কঠিন। ইহারা খুব বড় পাখী,—আকারে প্রায় এক-একটা চিলের সমান। ইহাদের "হুম্ হুম্" শব্দ শুনিলে রাত্রিতে বাস্তবিকই ভয় লাগে। হুতুম-পেঁচারা জলাশয় হইতে মাছ ধরিয়া খায়, ইহা শুনিয়াছি।

পেঁচারা কাক ও শালিকদের মতো খড়কুটা দিয়া বাসা বাঁধে না। তাই গাছের কোটর, দেওয়ালের ফাটাল উহাদের

বাসার জায়গা হয়। পেঁচাদের ডিমগুলি ফুটফুটে সাদা, কিন্তু সংখ্যায় কখনই বেশি হয় না। তোমরা খোঁজ করিলে পেঁচাদের এক-একটা বাসায় কখনই দুইটির বেশি ডিম দেখিতে পাইবে না। অন্য পাখীরা ভয়ে পেঁচাদের ডিম নষ্ট করিতে পারে না, তাই উহারা যে দুই-একটি ডিম পাড়ে তাহা হইতে বাচ্চা বাহির হয়।

জলচর

বক

যে-সব পাখী নদী খাল বা পুষ্করিণীর ধারে চরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে বোধ করি বকই প্রধান। তাই বকদের বিষয়ই তোমাদিগকে আগে বলিতেছি।

তোমরা কত রকম বক দেখিয়াছ, জানি না। বাংলা-দেশের নানা জায়গায় সাত-আট রকমের বক দেখা যায়। সাদা কাঁক, লাল কাঁক, কোঁচ বক, গাই বগ্‌লা, কানা বগ্‌লা, নীল বগ্‌লা, কাঠ বগ্‌লা, এই রকম নানা নামের নানা বক আছে। আমরা ইহাদের সবগুলির কথা বলিতে পারিব না। যে-সব বক সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে, কেবল তাহাদেরি কথা একটু-একটু বলিব। বকমাত্রেরই গলা এবং পা শরীরের তুলনায় বেজায় লম্বা। এই লম্বা গলা ঘাড়ের কাছে টানিয়া রাখিয়া খুব ভালো মানুষের মতো ইহারা জলের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। তার পরে কাছে ছোটো পোকামাকড় বা

মাছ দেখিতে পাইলেই আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া শিকারের কাছে যায় এবং লম্বা গলাটাকে বাড়াইয়া শিকার ধরে। বকেরা যখন গলা লম্বা করিয়া শিকার ধরিতে যায়, তখন তাহা দেখিতে বড় মজা লাগে। সে-সময়ে অন্য কোনো দিকেই তাহাদের নজর থাকে না। বকের দল যখন ঝাঁক বাঁধিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়, তখন তাহাদের লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, তাহাদের পা পিছনে ছড়াইয়া আছে এবং লম্বা গলা ঘাড়ে গুটানো রহিয়াছে। গলা লম্বা রাখিয়া এবং পা ঝুলাইয়া ইহারা কখনই উড়ে না। বুনো হাঁস, পানকৌড়ি ও সারসেরা কিন্তু গলা লম্বা রাখিয়া উড়িয়া বেড়ায়। তাই কোনো পাখীর ঝাঁক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, তাহা বকের ঝাঁক কি না, দেখিলেই বলা যায়। তোমরা ইহা এই-বারে লক্ষ্য করিয়ো।

আমরা প্রথমেই কোঁচ বকের কথা বলিব। তোমাদের গ্রামের বিল বা খালে ইহাদের দেখিতে পাইবে। এই বক-দের গায়ের পালকের রঙ্ বাদামি হইলেও তাহার উপরে একটু সবুজের আভা থাকে। তাই যখন জলের ধারের লম্বা ঘাসের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন ইহাদিগকে চেনাই যায় না। কিন্তু তাড়া পাইয়া যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ডানার ভিতরকার ফুট্‌ফুটে সাদা পালক-গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তাহাদের গায়ে যে বাদামি ও সবুজ পালক আছে, তখন তাহা জানাই যায় না। বৈশাখ মাসের

বিকালে পশ্চিমে গাঢ় কালো মেঘ করিয়াছে,—বকেরা সারি বাঁধিয়া বাসায় ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে কালো মেঘের গায়ে সাদা বকগুলিকে বড়ই সুন্দর দেখায়। তোমরা ইহা হয় ত দেখিয়াছ। তখন বকদের গায়ে যে সবুজ পালক আছে, তাহা মনেই হয় না।

বকেরা রাত্রিতে কোথায় থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। কাক ও শালিকেরা যেমন গ্রামের বাহিরে কোনো একটা গাছে জমা হইয়া রাত কাটায় ইহারাও তাহাই করে। আমাদের গ্রামের পুকুরের ধারে একটা অশথ গাছে বকদের এই রকম এক আড্ডা ছিল। সন্ধ্যা হইলেই দলে দলে সেই গাছে আসিয়া বসিত, কিন্তু শালিকদের মতো তাহারা কখনই চীৎকার করিয়া ঝগড়া-ঝাঁটি করিত না।

কোঁচ বক

পরস্পর ঝগড়া করা বকদের স্বভাব নয়। আমাদের মধ্যে এক-একজন লোক আছে, যাহারা কোনক্রমেই ভোরে উঠিতে পারে না। যখন রোদ উঠে তখনও বিছানায় পড়িয়া থাকে, তার পরে অনেক বেলা হইলে উঠিয়া হাত-মুখ ধোয়। ভোরের আলো পূব-আকাশে দেখা দিবা মাত্র, কাক, কোকিল ও শালিকেরা বাসায় বসিয়াই ডাকিতে সুরু করে এবং তার পরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই ছুটিয়া চরিতে বাহির হয়। কিন্তু বকেরা কখনই তাহা করে না। ভোর বেলায় যখন

চারিদিক রোদে ছাইয়া যায়, তখন উহারা জোড়ায়-জোড়ায় বা একে-একে গাছ ছাড়িয়া চরিতে বাহির হয়।

কাক, চিল ও শালিকেরা বাসা বাঁধিবার জন্য মাটি হইতে শুক্‌না ডাল-পাতা ও খড় লইয়া গাছে জমা করে। বকেরা কিন্তু তাহা করে না,—নিকটের গাছ হইতেই শুক্‌না ডাল ঠোঁট দিয়া ভাঙিয়া তাহারা বাসায় লইয়া যায়। বর্ষার প্রথমে এক-একটা গাছে বকেরা এই রকমে অনেক বাসা বাঁধে। এক গাছে কেবল এক জোড়া বকে বাসা বাঁধিয়াছে ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। আমরা এক সময়ে একটা আম-গাছে পনেরোটা বকের বাসা দেখিয়াছিলাম। গাছের তলা তাহাদের বিষ্ঠা এবং শামুক-গুগ্‌লির খোলায় ছাইয়া থাকিত; দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যাইত না। বোধ করি, শামুক-গুগ্‌লি ঠোঁটে করিয়া আনিয়া বকেরা ছানাদের খাওয়াইত। মাছের কাঁটাও সেই গাছের তলায় অনেক ছড়ানো দেখিয়াছি।

গাই বগ্‌লা

গাই বগ্‌লা বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কোঁচ বকদের মতো ইহারা জলের ধারে একা-একা থাকে না; গরুর পালের পিছনে ইহারা দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। আমরা গ্রামের বাহিরে এক-একটা মাঠে এই রকম বকদের পঞ্চাশ-ষাটটাকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিয়াছি। দূর হইতে

দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলো সাদা জিনিস মাঠে পড়িয়া আছে;—কাছে গেলে বক বলিয়া চিনিতে পারা যায়। গরুর পিছনে পিছনে চরিয়া বেড়ায় বলিয়াই বোধ হয় এই বকদের "গাই বগ্‌লা" বলা হয়। গরুর সঙ্গে ইহারা চরিয়া বেড়ায় কেন, তোমরা বোধ করি তাহা জানো না। কোকিলদের ও শালিকদের মতো বকেরা ফল-মূল খায় না, ছোটো পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু গাই বগ্‌লারা পুকুরের ধারে গিয়া খাবার সন্ধান করে না। মাঠে ঘাসের মধ্যে যে-সব ফড়িং ও অন্য পোকা লুকাইয়া থাকে, তাহাই ধরিয়া খাইবার জন্য তাহারা মাঠে যায়। তার পরে গরুর পাল মাঠে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে ঘাসের মধ্যেকার ফড়িং ও অন্য পোকামাকড় যখন ভয়ে লাফাইয়া পালাইতে চায়, তখন ঐ বকেরা সেগুলিকে ধরিয়া খায়। এই জন্যই ইহাদিগকে প্রায়ই গরুর পালের পিছনে থাকিতে দেখা যায়। তাহা হইলে দেখ, গাই বগ্‌লা বোকা পাখী নয়,—গরুর পালের পায়ের শব্দে যে ঘাসের ভিতরকার পোকামাকড় লাফাইয়া উঠিবে, তাহা উহারা জানে, তাই সেই সব পোকা খাইবার লোভে গরুর পিছন ছাড়ে না। শিকারীরা কি-রকমে বাঘ ও শূয়োর শিকার করে, তাহার গল্প বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। যে জঙ্গলে বাঘ আছে অনেক লোক মিলিয়া তাহা ঘেরিয়া দাঁড়ায় এবং তার পরে লাঠি দিয়া জঙ্গল পিটাইয়া হৈ-চৈ করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর

বহু কষ্টে একটা ইঁদুর ধরিয়া গাছের উপরে রাখিতে যাইতেছে। কোড়ল পাখী যদি ইহা দেখিতে পায়, তবে ছোঁ মারিয়া চিলের শিকার কাড়িয়া লইয়া পালায়। চিলেরা কোড়লদের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতিতে পারে না। শিকারীরা বুনো হাঁস প্রভৃতি গুলি করিয়া মারিয়াছে, কোথা হইতে কোড়ল পাখী আসিয়া মরা হাঁস চুরি করিয়া লইয়া পালাইল, —ইহাই অনেক দেখা যায়। কোড়ল পাখীরা অগ্রহায়ণ মাসে বাসা বাঁধিবার জোগাড় করে, পৌষ মাসে ইহাদের ডিম ও বাচ্চা হয়।

বাজ ও চিল জাতির অনেক সাধারণ পাখীর কথা তোমাদিগকে বলিলাম। এগুলি ছাড়া সাপমারী, মাছমারী, বৈরী প্রভৃতি আরো কয়েক রকম শিকারী পাখী সময়ে সময়ে আমাদের দেশে দেখা যায়। কিন্তু ইহারা বনে-জঙ্গলে বেড়ায়, সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে না। তাই আমরা তাহাদের কথা এখানে বলিলাম না।

শকুন

শকুনেরা মাংস খায়, কিন্তু প্রায়ই শিকার করিয়া মাংস খায় না। যে-সব মরা গরু ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার মাঠে ফেলিয়া দেওয়া হয়, তাহাদেরি পচা মাংস ইহারা ছিঁড়িয়া খাইতে ভালবাসে। কাজেই, শকুনদের ঠিক শিকারী পাখী বলা চলে না। যাহা হউক, শকুনরা আমাদের কম উপকার করে না। গ্রামে যত গরু ঘোড়া কুকুর বিড়াল মারা যায়, সেগুলি যদি মাঠে থাকিয়া পচিত, তাহা হইলে বোধ করি দুর্গন্ধে দেশে থাকা দায় হইত। চিল, শকুন ও কাকদের মতো পাখীরা এবং শেয়াল-কুকুরদের মত জানোয়ারেরা মরা জন্তুদের খাইয়া ফেলে বলিয়াই, সেগুলি মাঠে-ঘাটে পচিতে পারে না।

আমাদের দেশে সাধারণত দু'রকমের শকুন দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ শকুন বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহারা প্রকাণ্ড পাখী। যখন আকাশের অনেক উপরে উড়িয়া বেড়ায় তখন কিন্তু ইহাদিগকে খুবই ছোটো মনে হয়। কাছে হইতে দেখিলেই ইহাদের ঠিক্ চেহারা

বুঝা যায়। ভাগাড়ের কাছে গাছের উপরে বসিয়া শকুনরা যখন রোদ পোহাইবে, তখন তোমরা ইহাদের চেহারা দেখিয়া লইয়ো।

সাধারণ শকুনদের মাথায় ও ঘাড়ে পালকের নাম-গন্ধ থাকে না। বোধ করি, মরা গরু ও ঘোড়ার পেটের ভিতরে মাথা প্রবেশ করাইয়া নাড়িভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতে হয় বলিয়াই ইহাদের মাথা নেড়া। গায়ের পালকের রঙ্ কতকটা গাঢ় ছাই রঙের,—পিছন দিক্‌টা কিন্তু সাদা। তা' ছাড়া ডানার ভিতরেও সাদা পালক আছে। তাই যখন শকুনরা অল্প উঁচুতে উড়ে, তখন ডানার তলা সাদা দেখায়। খুব উঁচুতে উঠিলে এই সাদা রঙ্ আর নজরে পড়ে না। যাহা হউক, শকুনরা কিন্তু ভারা নোংরা পাখী। গায়ের দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। পচা মাংস খায় বলিয়াই বোধ করি এত দুর্গন্ধ। কাক ও চিলেরা নোংরা জিনিস খায় বটে, কিন্তু প্রত্যহ স্নান করে। শকুনরা স্নানের জন্য জলের কাছে যায় না। অথচ ডানা মেলিয়া রোদ্ পোহান রাছে। তোমরা ইহাদের ডানা মেলিয়া রোদ্ পোহাইতে দেখ নাই কি? আমাদের বাগানের তাল-গাছের মাথায় কয়েকটা শকুন থাকিত। তাহারা ভোর বেলা হইতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত ডানা খুলিয়া রোদ্ পোহাইত। তার পরে আকাশের খুব উপরে উঠিয়া

শকুন

কোন্ ভাগাড়ে মরা গরু পড়িয়া আছে, তাহার সন্ধান করিত। শকুনদের চোখের তেজ খুব বেশি। এই জন্যই খুব দূর হইতে কোথায় কোন্ মরা জন্তু পড়িয়া আছে, তাহা দেখিতে পায়। তাহাদের ডানার জোর এত বেশি যে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আকাশে উড়িয়াও ইহারা ক্লান্ত হয় না। কখনো কখনো শকুনরা মাটি হইতে তিন-চারি হাজার ফুট উপরে উঠে।

ভাগাড়ে গরু মরিলে শকুনের মাথায় টনক্ নড়ে,—এই রকম একটা কথা আছে। কিন্তু তাহা ঠিক্ কথা নয়। দূরে কোন জন্তু মরিলে, ইহারা চোখ দিয়াই দেখিতে পায়। তার পরে প্রথমে একটা বা দু'টা শোঁ-শোঁ করিয়া সেই মরা জন্তুর কাছে আসিয়া বসে এবং ইহাদের দেখাদেখি আরো অনেক শকুন এক জায়গায় জমা হয়। আধ-মরা গরু বাছুরকে শকুনরা টানিয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে, ইহা আমরা অনেক দেখিয়াছি।

গিন্নি-শকুন তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি শকুনেরই এক উপজাতি,—কিন্তু চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং সাধারণ শকুনদের চেয়ে দেখিতে বিশ্রী। ইহাদের গায়ের অধিকাংশ পালকের রঙ্ গাঢ় খয়েরি। কিন্তু পায়ে যেন কিছু কিছু সাদা পালক আছে। নেড়া মাথার চাম্ড়ার রঙ্ আবার লাল। মাথার দুই পাশে আবার কানের মতো দুইটা লাল অংশ ঝুলিতে থাকে। এ সব মিলিয়া গিন্নি-শকুনদের ভারী বিশ্রী দেখায়। ভাগাড়ে মরা গরু ফেলিয়া দিলে যেমন

সাধারণ শকুনরা চারিদিক হইতে হুস্ হুস শব্দে আসিয়া হাজির হয় ইহারা সে-রকম দল বাঁধিয়া চলা-ফেরা করে না। আমরা ইহাদিগকে গো-ভাগাড়ে একটা বা ছুটির বেশি আসিতে দেখি নাই। যাহা হউক, কাক চিল কুকুর শিয়াল সকলেই গিন্নি-শকুনদের খুব মান্য করিয়া চলে। ভাগাড়ে কাক চিল শকুন শিয়াল ও কুকুরে মিলিয়া খুব খানা চালাইতেছে,—মাঝে মাঝে সাধারণ শকুনরা "চ্যাঁ-চ্যাঁ" শব্দ করিয়া কুকুর-শিয়ালদের তাড়াইয়া মাংস ছিঁড়িয়া পেটে পুরিতেছে,—এমন সময় যদি একটা গিন্নি-শকুন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সব আনন্দ-কোলাহল ঝগড়া-ঝাঁটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন কুকুর লেজ গুটাইয়া দূরে গিয়া বসে, শকুনরা ডানা মেলিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভাগাড়ের ছোটো বট-গাছটির উপরে আশ্রয় লয়। এ দিকে গিন্নি-শকুন পেট ভরিয়া আহার করিতে থাকে। অন্য সকলে কেন গিন্নি-শকুনদের এত মান্য করে, তাহা জানি না।

এই ছুই রকম শকুন ছাড়া আমাদের দেশে কখনো কখনো এক রকম সাদা শকুন দেখা যায়। এগুলি বোধ করি তোমরা দেখ নাই। ইহারা আকারে চিলের চেয়ে বেশি বড় হয় না। কিন্তু চেহারা ভারি বিশ্রী! পালকের রঙ্ এক রকম ময়লাটে সাদা, ঠোঁট, মুখ, পায়ের রঙ্ হল্‌দে। পায়খানার ময়লা ইহাদের প্রধান আহার। তাই যেখানে ময়লা পোঁতা হয় সেখানে ইহাদিগকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা

যায়। বিহার ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে রাস্তা-ঘাটের ময়লা খাইবার জন্য এই শকুনরা দলে দলে বেড়ায়।

শকুনের বাসা বোধ করি তোমরা সকলে দেখ নাই। গাছের খুব উঁচু ডালে ইহারা শুক্‌না ডাল-পালা দিয়া শীত-কালে বাসা বাঁধে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, কাক শালিক-দের মতো ইহারা বাসার জন্য গাছের তলা হইতে শুক্‌না কাটা-কুটা কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহারা তাহা করে না। সেই বাঁকানো এবং চেপ্‌টা ঠোঁট দিয়া ইহারা পাতা সমেত গাছের কাঁচা ডাল ভাঙ্গিয়া বাসা তৈয়ারি করে। যখন ইহারা ডানা মেলিয়া গাছের কাঁচা ডাল ভাঙে, তখন তাহাদের চেহারাগুলি দেখিলে হাসি পায়।

বাসা তৈয়ারির সময়ে শকুনদের মেজাজও ভয়ানক চটা রকমের হয়। এই সময়ে তাহারা প্রায়ই পরস্পর মারামারি ও কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি করে। তোমাদের বাড়ীর কাছে তাল-গাছে যদি শকুনের আড্ডা থাকে, তবে বাসা তৈয়ারি ও ডিম পাড়ার সময়ে ইহাদের চীৎকার শুনিতে পাইবে। শকুনরা প্রায়ই বাসায় একটার বেশি ডিম পাড়ে না। কিন্তু সেই একটাতেই বাচ্চা হয়। অন্য পাখীরা ভয়ে শকুনের বাসায় উৎপাত করে না। উহাদের নোংরামি ও গায়ের দুর্গন্ধের জন্য মানুষেও বাসার কাছে ঘেঁসে না। তাই শকুনদের ডিম প্রায়ই নষ্ট হয় না। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, যে-সব পাখীর ডিম বেশি নষ্ট হয়, কেবল তাহারাই বেশি ডিম পাড়ে।

পেঁচা

তোমরা কত রকম পেঁচা দেখিয়াছ জানি না। আমরা কিন্তু লক্ষ্মী পেঁচা, কোটরে পেঁচা, কাল পেঁচা প্রভৃতি অনেক রকম পেঁচা দেখিয়াছি।

পেঁচারা শিকারী পাখী। রাত্রিতে শিকারে বাহির হইয়া ইঁদুর ব্যাঙ্, পাখীদের ছানা ও ডিম চুরি করিয়া খাইয়া পেট ভরায়। পোকামাকড়ও ইহারা পছন্দ করে। যখন বড় শিকার না জোটে, তখন ছোটো-বড় পোকা খাইয়াই তাহাদের পেট ভরাইতে হয়।

পেঁচাদের দিনের বেলায় প্রায়ই দেখা যায় না। কেহ গাছের কোটরে, কেহ পোড়ো ভাঙা বাড়ীর ভিতরে, কেহ বা বাড়ীর বারান্দার কার্ণিশের উপরে লুকাইয়া দিন কাটায়। তারপরে সন্ধ্যা হইলে সেই সব জায়গা হইতে বাহির হইয়া শিকারের সন্ধানে ঘুরিতে আরম্ভ করে। পায়রারা যখন উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের ডানায় কি-রকম চটা-পট্ শব্দ হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। তা' ছাড়া অন্য পাখীরাও উড়িবার সময়ে শব্দ করে। কিন্তু পেচাঁরা যখন

উড়িয়া বেড়ায় তখন তাহাদের ডানার একটুও শব্দ হয় না। তাই চোরের মতো নিঃশব্দে গিয়া ইহারা পাখীদের ডিম ও ছানা চুরি করিয়া খাইতে পারে। এই রকমে চুরি করার জন্য পেঁচাদের উপরে সব পাখীরই ভয়ানক রাগ। তাই দিনের বেলায় তাহারা বাহিরে আসে না। যদি হঠাৎ বাহিরে আসে, তাহা হইলে কাক, কোকিল, ফিঙে সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে ঠোক্‌রাইতে আরম্ভ করে।

লক্ষ্মী পেঁচা তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহারা নিতান্ত ছোটো পাখী নয়। মুখগুলি যেন চাকার মতো গোল, কিন্তু শরীরটা অন্য পেঁচাদের তুলনায় যেন একটু লম্বা। রঙ্ লালচে কিন্তু মুখগুলি সাদা। গায়ে আবার সাদা ডোরা থাকে। পোড়ো বাড়ী ও নিরিবিলি জায়গায় লুকাইয়া ইহারা দিন কাটায়। বোধ করি, দিনের আলো ইহাদের চোখে ভাল লাগে না। অনেক দিন আগে আমাদের ভাঁড়ার ঘরের পাশে এক জোড়া লক্ষ্মী পেঁচা ছিল। একটু কাছে গেলেই তাহারা "ফোঁস্ ফোঁস্" করিয়া শব্দ করিত; মুখভঙ্গী করিয়া এবং চোখ পাকাইয়া ভয় দেখাইত। আমরা ভয়ে পালাইয়া যাইতাম। দিনের বেলায় বিরক্ত করিলে লক্ষ্মী পেঁচারা এই রকমেই ভয় দেখায়। আবার কখনো এক রকম "ফোঁস-ফাঁস্" শব্দ করিয়া পরস্পর কথাবার্ত্তাও বলে।

"পেঁচা

গৃহস্থেরা বলে, লক্ষ্মী পেঁচা ঘরে থাকিলে লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে। তাই বাড়ীতে আশ্রয় লইলে কেহই এই পাখীদের তাড়াইতে চায় না। কিন্তু ইহারা যখন রাত্রিতে চীৎকার করে, তখন ভারী রাগ হয়।

গভীর রাত্রিতে হঠাৎ অনেকগুলি পেঁচা এক সঙ্গে "কিচ্-কিচ্" করিয়া ডাকিয়া উঠিল, ইহা প্রায়ই শুনা যায়। এই ডাকে অনেক সময় ঘুমও ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাই কোটরে পেঁচার ডাক। ঠিক্ সন্ধ্যার সময়ে বাসা হইতে বাহির হইয়াই ইহারা ছুই-চারিটায় মিলিয়া এক চোট্ ডাকিয়া লয়। তার পরে শিয়ালেরা যেমন মাঝে মাঝে এক সঙ্গে চীৎকার করে, ইহারাও সেই রকমে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে। কেন যে এই রকম চীৎকার করিয়া লোক-জনের ঘুম ভাঙায়, তাহা উহারাই জানে। যাহা হউক, রাত্রিতে পেঁচাদেব এই রকম ডাক ভারি খারাপ লাগে।

কোটরে পেঁচারা আকারে লক্ষ্মী পেঁচার চেয়ে অনেক ছোটো। ইহাদের বুকের তলার অনেক পালক সাদা কিন্তু শরীরের উপরকার রঙ্ মেটে-লাল,—তার উপরে সাদা ফোঁটা ও ডোরাও থাকে। গাছের কোটরে বা বাড়ীর বারান্দার কার্ণিসের উপরে ইহাদিগকে প্রায়ই থাকিতে দেখা যায়। দিনে বাহির হইয়া গাছের পাতার আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, ইহাও আমরা দেখিয়াছি।

কাল-পেঁচা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। ইহারা ভারি বিশ্রী পাখী। গভীর রাত্রিতে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, তখন বাগানের গাছে বসিয়া এক মিনিট বা আধ মিনিট অন্তর ইহারা "কুঃ-কুঃ" শব্দ করে। এই শব্দ ভয়ানক বিশ্রী শুনায়। আমাদের বাড়ীর কাছে একটা বট-গাছে প্রত্যেক রাত্রিতেই একটা কাল-পেঁচা ঐ রকমে ডাকিত। এই শব্দ শুনিয়া, কেন জানি না, বড় ভয় হইত। এক রাত্রিতে লাঠি হাতে করিয়া পাখীটাকে তাড়া করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি, কাল-পেঁচাদের দেখিতে কতকটা কোটরে পেঁচাদেরই মতো। কেবল ইহাদের দুই কানের কাছে, দুই গোছা পালক উঁচু হইয়া থাকে। তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন কাল-পেঁচাদের মাথায় শিং আছে। যাহা হউক ইহারা ভারি ভীরু পাখী, তাই দিনের বেলায় প্রায়ই বাহির হয় না,—রাত্রিতেও অতি সাবধানে চরিয়া বেড়ায়।

হুতুম-পেঁচাদেরও সচরাচর দেখা বড় কঠিন। ইহারা খুব বড় পাখী,—আকারে প্রায় এক-একটা চিলের সমান। ইহাদের "হুম্ হুম্" শব্দ শুনিলে রাত্রিতে বাস্তবিকই ভয় লাগে। হুতুম-পেঁচারা জলাশয় হইতে মাছ ধরিয়া খায়, ইহা শুনিয়াছি।

পেঁচারা কাক ও শালিকদের মতো খড়কুটা দিয়া বাসা বাঁধে না। তাই গাছের কোটর, দেওয়ালের ফাটাল উহাদের

বাসার জায়গা হয়। পেঁচাদের ডিমগুলি ফুটফুটে সাদা, কিন্তু সংখ্যায় কখনই বেশি হয় না। তোমরা খোঁজ করিলে পেঁচাদের এক-একটা বাসায় কখনই দুইটির বেশি ডিম দেখিতে পাইবে না। অন্য পাখীরা ভয়ে পেঁচাদের ডিম নষ্ট করিতে পারে না, তাই উহারা যে দুই-একটি ডিম পাড়ে তাহা হইতে বাচ্চা বাহির হয়।

জলেচর

বক

যে-সব পাখী নদী খাল বা পুষ্করিণীর ধারে চরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে বোধ করি বকই প্রধান। তাই বকদের বিষয়ই তোমাদিগকে আগে বলিতেছি।

তোমরা কত রকম বক দেখিয়াছ, জানি না। বাংলা-দেশের নানা জায়গায় সাত-আট রকমের বক দেখা যায়। সাদা কাঁক, লাল কাঁক, কোঁচ বক, গাই বগ্‌লা, কানা বগ্‌লা, নীল বগ্‌লা, কাঠ বগ্‌লা, এই রকম নানা নামের নানা বক আছে। আমরা ইহাদের সবগুলির কথা বলিতে পারিব না। যে-সব বক সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে, কেবল তাহাদেরি কথা একটু-একটু বলিব। বকমাত্রেরই গলা এবং পা শরীরের তুলনায় বেজায় লম্বা। এই লম্বা গলা ঘাড়ের কাছে টানিয়া রাখিয়া খুব ভালো মানুষের মতো ইহারা জলের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। তার পরে কাছে ছোটো পোকামাকড় বা

মাছ দেখিতে পাইলেই আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া শিকারের কাছে যায় এবং লম্বা গলাটাকে বাড়াইয়া শিকার ধরে। বকেরা যখন গলা লম্বা করিয়া শিকার ধরিতে যায়, তখন তাহা দেখিতে বড মজা লাগে। সে-সময়ে অন্য কোনো দিকেই তাহাদের নজর থাকে না। বকের দল যখন ঝাঁক বাঁধিয়া মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায়, তখন তাহাদের লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, তাহাদের পা পিছনে ছড়াইয়া আছে এবং লম্বা গলা ঘাড়ে গুটানো রহিয়াছে। গলা লম্বা রাখিয়া এবং পা ঝুলাইয়া ইহারা কখনই উড়ে না। বুনো হাঁস, পানকৌড়ি ও সারসেরা কিন্তু গলা লম্বা রাখিয়া উড়িয়া বেড়ায়। তাই কোনো পাখীর ঝাঁক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেলে, তাহা বকেব ঝাঁক কি না, দেখিলেই বলা যায়। তোমরা ইহা এই-বারে লক্ষ্য করিয়ো।

আমরা প্রথমেই কোঁচ বকের কথা বলিব। তোমাদেব গ্রামের বিল বা খালে ইহাদের দেখিতে পাইবে। এই বক-দের গায়ের পালকের রঙ্ বাদামি হইলেও তাহার উপরে একটু সবুজের আভা থাকে। তাই যখন জলের ধারের লম্বা ঘাসের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তখন ইহাদিগকে চেনাই যায় না। কিন্তু তাড়া পাইয়া যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ডানার ভিতরকার ফুট্‌ফুটে সাদা পালক-গুলি স্পষ্ট দেখা যায়। তাহাদের গায়ে যে বাদামি ও সবুজ পালক আছে, তখন তাহা জানাই যায় না। বৈশাখ মাসের

বিকালে পশ্চিমে গাঢ় কালো মেঘ করিয়াছে,—বকেরা সারি বাঁধিয়া বাসায় ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে কালো মেঘের গায়ে সাদা বকগুলিকে বড়ই সুন্দর দেখায়। তোমরা ইহা হয় ত দেখিয়াছ। তখন বকদের গায়ে যে সবুজ পালক আছে, তাহা মনেই হয় না।

বকেরা রাত্রিতে কোথায় থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা সকলে জানো না। কাক ও শালিকেরা যেমন গ্রামের বাহিরে কোনো একটা গাছে জমা হইয়া রাত কাটায় ইহারাও তাহাই করে। আমাদের গ্রামের পুকুরের ধারে একটা অশথ গাছে বকদের এই রকম এক আড্ডা ছিল। সন্ধ্যা হইলেই দলে দলে সেই গাছে আসিয়া বসিত, কিন্তু শালিকদের মতো তাহারা কখনই চীৎকার করিয়া ঝগড়া-ঝাঁটি করিত না।

কোঁচ-বক

পরস্পর ঝগড়া করা বকদের স্বভাব নয়। আমাদের মধ্যে এক-একজন লোক আছে, যাহারা কোনক্রমেই ভোরে উঠিতে পারে না। যখন রোদ উঠে তখনও বিছানায় পড়িয়া থাকে, তার পরে অনেক বেলা হইলে উঠিয়া হাত-মুখ ধোয়। ভোরের আলো পূব-আকাশে দেখা দিবা মাত্র, কাক, কোকিল ও শালিকেরা বাসায় বসিয়াই ডাকিতে সুরু করে এবং তার পরে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই ছুটিয়া চরিতে বাহির হয়। কিন্তু বকেরা কখনই তাহা করে না। ভোর বেলায় যখন

চারিদিক রোদে ছাইয়া যায়, তখন উহারা জোড়ায়-জোড়ায় বা একে-একে গাছ ছাড়িয়া চরিতে বাহির হয়।

কাক, চিল ও শালিকেরা বাসা বাঁধিবার জন্য মাটি হইতে শুক্‌না ডাল-পাতা ও খড় লইয়া গাছে জমা করে। বকেরা কিন্তু তাহা করে না,—নিকটের গাছ হইতেই শুক্‌না ডাল ঠোঁট দিয়া ভাঙিয়া তাহারা বাসায় লইয়া যায়। বর্ষার প্রথমে এক-একটা গাছে বকেরা এই রকমে অনেক বাসা বাঁধে। এক গাছে কেবল এক জোড়া বকে বাসা বাঁধিয়াছে ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। আমরা এক সময়ে একটা আম-গাছে পনেরোটা বকের বাসা দেখিয়াছিলাম। গাছের তলা তাহাদের বিষ্ঠা এবং শামুক-গুগ্‌লির খোলায় ছাইয়া থাকিত; দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যাইত না। বোধ করি, শামুকগুগ্‌লি ঠোঁটে করিয়া আনিয়া বকেরা ছানাদের খাও-য়াইত। মাছের কাঁটাও সেই গাছের তলায় অনেক ছড়ানো দেখিয়াছি।

গাই বগ্‌লা

গাই বগ্‌লা বোধ করি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। কোঁচ বকদের মতো ইহারা জলের ধারে একা-একা থাকে না; গরুর পালের পিছনে ইহারা দল বাঁধিয়া চরিয়া বেড়ায়। আমরা গ্রামের বাহিরে এক-একটা মাঠে এই রকম বকদের পঞ্চাশ-ষাটটাকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিয়াছি। দূর হইতে

দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলো সাদা জিনিস মাঠে পড়িয়া আছে;—কাছে গেলে বক বলিয়া চিনিতে পারা যায়। গরুর পিছনে পিছনে চরিয়া বেড়ায় বলিয়াই বোধ হয় এই বকদের "গাই বগ্‌লা" বলা হয়। গরুর সঙ্গে ইহারা চরিয়া বেড়ায় কেন, তোমরা বোধ করি তাহা জানো না। কোকিলদের ও শালিকদের মতো বকেরা ফল-মূল খায় না, ছোটো পোকা-মাকড়ই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু গাই বগ্‌লারা পুকুরের ধারে গিয়া খাবার সন্ধান করে না। মাঠে ঘাসের মধ্যে যে-সব ফড়িং ও অন্য পোকা লুকাইয়া থাকে, তাহাই ধরিয়া খাইবার জন্য তাহারা মাঠে যায়। তার পরে গরুর পাল মাঠে চলিয়া-ফিরিয়া বেড়াইলে ঘাসের মধ্যেকার ফড়িং ও অন্য পোকামাকড় যখন ভয়ে লাফাইয়া পালাইতে চায়, তখন ঐ বকেরা সেগুলিকে ধরিয়া খায়। এই জন্যই ইহাদিগকে প্রায়ই গরুর পালের পিছনে থাকিতে দেখা যায়। তাহা হইলে দেখ, গাই বগ্‌লা বোকা পাখী নয়,—গরুর পালের পায়ের শব্দে যে ঘাসের ভিতরকার পোকামাকড় লাফাইয়া উঠিবে, তাহা উহারা জানে, তাই সেই সব পোকা খাইবার লোভে গরুর পিছন ছাড়ে না। শিকারীরা কি-রকমে বাঘ ও শূয়োর শিকার করে, তাহার গল্প বোধ করি তোমরা শুনিয়াছ। যে-জঙ্গলে বাঘ আছে অনেক লোক মিলিয়া তাহা ঘেরিয়া দাঁড়ায় এবং তার পরে লাঠি দিয়া জঙ্গল পিটাইয়া হৈ-চৈ করিতে করিতে জঙ্গলের ভিতর

মাটিতেই তাহাদিগকে চরিয়া বেড়াইতে হয় এবং ডিম-পাড়ার সময় হইলে জলের উপরে ডাল পালা খড়কুটা জমা করিয়া তাহারি উপরে ডিম পাড়িতে হয়। পাছে শিয়াল কুকুর বা অন্য জন্তুরা ডিম নষ্ট করে, এই ভয়েই সারসেরা জলের উপরে ঘাস ও খড়ের ভেলা তৈয়ারি করিয়া তাহার উপরে ডিম পাড়ে। হাঁস ও মুরগীরা যেমন সারা বৎসর ধরিয়া গণ্ডায় গণ্ডায় ডিম পাড়ে, ইহারা সে-রকম করে না। বর্ষাকালই সারসদের ডিম পাড়ার সময়। এই সময়ে ইহারা দু'টার বেশি ডিম পাড়ে না। ডিমগুলির রঙ হয় যেন ঘোলাটে সাদা।

আমাদের গ্রামের বাঁধের ধারে ছোটো জাতের সারসদের চরিতে দেখিয়াছি। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদিগকে কখনই জোড়া ভিন্ন দেখা যায় না। একটা সারস একাকী চরিয়া বেড়াইতেছে ইহা কখনই দেখি নাই। শুনিয়াছি, স্ত্রী ও পুরুষ সারসের মধ্যে ভাবও নাকি খুব বেশী। এক জোড়া সারসের মধ্যে যদি কোনো রকমে একটি মারা পড়ে, তাহা হইলে অন্যটি শোকে অধীর হয় এবং কখনো কখনো আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে।

সারস পাখীরা কাহারো কোনো অনিষ্ট করে না, কিন্তু তথাপি শিকারীরা গুলি করিয়া ও ফাঁদ পাতিয়া ইহাদের ধরে এবং ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করে। সারসের মাংস নাকি সুখাদ্য, তাই ইহাদের উপরেই শিকারীরা বেশী গুলি চালায়।

সন্তরণকারী

পানকৌড়ি

"পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠ না।
তোমার শাশুড়ী বলেছে বেগুন কোটো না॥"

ছেলেবেলায় খালের ধারে দাঁড়াইয়া পানকৌড়িদের কত ডাকিয়াছি, কিন্তু একটাও কাছে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। জলে আসিলে তাহারা ডাঙার কথা একেবারে ভুলিয়া যায়।

তোমাদের মধ্যে যাহারা গ্রামে বাস কর, তাহাদের কাছে পানকৌড়ির বিশেষ পরিচয় দিবার দরকার নাই। যাহারা সহরে বাস করে, তাহারা বোধ করি এই পাখীদের কখনো দেখে নাই। পানকৌড়িরা বড় মজার পাখী,—রাত্রিটুকু ছাড়া সমস্ত দিনই তাহারা বিলের বা খালের ধারে কাটাইয়া দেয়। সাঁতার দিতে ও ডুব দিতে ইহাদের একটুও কষ্ট হয় না। এমন রাক্ষুসে পাখীও বোধ করি দুনিয়ায় আর দেখা যায় না; খাই-খাই করিয়াই
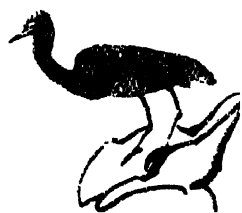
পানকৌড়ি

তাহাদের জীবনটা কাটিয়া যায়। উড়িয়া উড়িয়া শরীর ক্লান্ত হইলে প্রায় সকল পাখীই গাছের ডালে বা মাটিতে বসিয়া বিশ্রাম করে। পানকৌড়িদের বিশ্রাম করা তোমরা দেখিয়াছ কি? জলে ডুব দিতে দিতে হাঁফ লাগিলে জলে পোঁতা খোঁটা বা বাঁশের উপরে বসিয়া দুইখানা ডানা খুলিয়া দেয় এবং তাহাদের সেই লম্বা সরু গলাটা বাঁকাইয়া চারিদিকে তাকাইতে থাকে। পানকৌড়িদের এই চেহারা দেখিলে হাসি পায়। ইহাই পানকৌড়িদের বিশ্রাম করা।

যখন খাল বা বিলের জলে ডুব দিয়া মাছ শিকার করে, তখন পানকৌড়িদের দাঁড়কাকের মতো কালো বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু সত্যই ইহারা সম্পূর্ণ কালো পাখী নয়। ইহাদের পিঠ ও ডানা ধূসর এবং লেজ ময়লা রকমের সাদা। আবার পা দুখানিও ধূসর। পানকৌড়িদের ঠোঁটগুলি বড় মজার। তাহার আগা বাঁকা, কিন্তু সমস্ত ঠোঁট সরু এবং চাপা রকমের। আমাদের দেশের জেলেরা উদ্‌বিড়াল পুষিয়া মাছ ধরে, চীন দেশের লোকে নাকি পোষা পানকৌড়ি দিয়া মাছ মারে। তাহারা পোষা পানকৌড়ি লইয়া নৌকা করিয়া নদীতে বা সমুদ্রে যায়। তার পরে মাছ দেখিলেই ঐ সব পোষা পাখী ছাড়িয়া দেয়,—পাখীরা মাছ ধরিয়া নৌকায় আনে। মাছ বড় হইলে একটা পাখীতে শিকার করিতে পারে না। তখন দুই তিনটা পাখী একত্র মিলিয়া মাছ মারিয়া নৌকায় আনে।

পানকৌড়িদের উড়িবার ভঙ্গী তোমরা দেখ নাই কি? লম্বা গলাটা সাম্‌নে আগাইয়া এবং পা দুখানি পিছনে ছড়াইয়া ইহারা উড়িয়া চলে। সন্ধ্যার আগে একটু নজর রাখিলে তোমাদের গ্রামের বিল হইতে ইহাদিগকে চারি পাঁচটায় ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিবে। চরিবার সময়ে ইহারা একা-একাই চরে, কিন্তু বাসায় ফিরিবার সময়ে এবং বাসা হইতে চরিতে বাহির হইবার সময়ে ঝাঁক বাঁধে। একটা পানকৌড়ি, সন্ধ্যার সময়ে মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, ইহা আমরা প্রায়ই দেখি নাই।

কাক ও শালিকদের মতো পানকৌড়িরা প্রায় বারো মাসই গাছের ডালে বসিয়া রাত কাটায়। তার পরে ডিম পাড়ার সময় আসিলে তাহাদের বাসা বাঁধার ধুম লাগিয়া যায়। বকদের মতো পানকৌড়িরা বর্ষাকালেই ডিম পাড়ে। তোমরা বোধ হয় পানকৌড়ির বাসা দেখ নাই। কাক ও বকের বাসার মতই তাহা খড়কুটা ও শুক্‌না ডালপালার স্তূপ বলিলেই চলে। বাসার শ্রীছাঁদ একটুও দেখা যায় না। যাহা হউক, এই রকম বাসায় তা দিবার মতো একটু জায়গা করিয়া তাহারা পাঁচ-ছয়টি করিয়া ডিম পাড়ে।

হাঁস

সমস্ত পৃথিবীতে দুই শত দশ উপজাতির হাঁস আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বনে-জঙ্গলে বাসা করিয়া থাকে ;
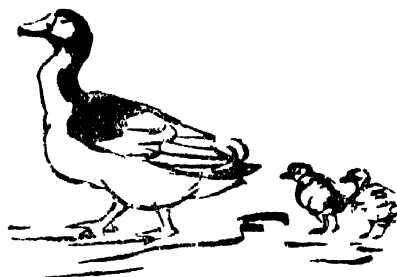
হাঁস

নদী খাল বিল প্রভৃতি জলাশয়ে চরিয়া বেড়ায় ; মানুষের কাছে বা গ্রামে আসে না। তাই আমরা সব হাঁসের পরিচয় তোমাদের দিব না। পরিচয় দিলে তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। কারণ, তাহাদের মধ্যে কেহ থাকে আমেরিকার ও আফ্রিকার জঙ্গলে, কেহ থাকে তিব্বতের ও মধ্য-এশিয়ার জলাশয়ে।

হাঁসের চেহারাগুলি কি রকম, তাহা পাতিহাঁস ও রাজ-

হাঁসের চেহারা দেখিলেই তোমরা জানিতে পারিবে। ইহাদের পা-গুলি ছোটো এবং পায়ের আঙুল পাতলা চামড়া দিয়া পরস্পর জোড়া। তাই ইহারা জলে সাঁতার দিতে পারে। হাঁসেরা কি-রকমে জলের তলায় মাথা গুঁজিয়া খাবারের সন্ধান করে, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। পানকৌড়িদের মতো ইহারা সম্পূর্ণ ডুব দেয় না। জলের তলায় খাবার সন্ধানের সময়ে তাহাদের শরীরের সম্মুখ ভাগ ও মাথা জলের তলায় যায় এবং পিছনটা থাকে জলের উপরে। এই রকমে খাবার সংগ্রহের সুবিধার জন্য হাঁসদের পা থাকে শরীরের পিছন দিকে। তাই ইহারা মাটিতে হাঁটিয়া বেড়াইবার সময়ে অন্য পাখীদের মতো তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না; যাহা হউক, হাঁসেরা যখন হেলিয়া-দুলিয়া চলিয়া বেড়ায় তখন তাহা দেখিতে মন্দ লাগে না। কিন্তু পাতিহাঁসদের সেই "প্যাক্ প্যাক্" শব্দ একটুও ভালো নয়।

হাঁসদের ঠোঁটের আকৃতি তোমরা বোধ করি সকলেই দেখিয়াছ। চড়াই বা চিলের ঠোঁটের সহিত হাঁসের ঠোঁটের একটুও মিল নাই। জলের তলায় পাঁক হইতে পোকামাকড় ও গাছ-গাছড়া তুলিয়া খাইবার জন্য ইহাদের ঠোঁট চেপ্টা ও চওড়া। হাঁসদের জিভগুলিও খুব পুরু এবং তাহার দুই পাশে আবার দুইটা মাংসের পিণ্ড থাকে। জলের তলার পাঁক ও কাদা মুখে লইয়া ঐ মাংসপিণ্ড দিয়া যেই চাপ দেয়, অমনি কাদা ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া যায়,—তখন

মুখে থাকে কেবল কাদার ভিতরকার ছোটো পোকামাকড়। বৃষ্টির পরে পাতিহাঁসেরা যখন তোমাদের বাড়ীর উঠানের কাদা ও জল চপ্ চপ্ করিয়া মুখে পুরিতে থাকিবে, তখন তোমরা ইহা লক্ষ্য করিয়ো। জিভের চাপে যাহাতে মুখের কাদা ও জল বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য হাঁসদের ঠোঁটের পাশগুলি যেন করাতের মতো কাটা-কাটা থাকে।

আমরা পাতিহাঁসদের সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলিব না। গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট্ প্রভৃতি জন্তুরা যেমন আমাদের ঘরাও প্রাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, পাতিহাঁসেরা ঠিক্ সেই রকম ঘরাও পাখী হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ, ডিম এবং মাংস খাইবার লোভে হাজার-হাজার বৎসর ধরিয়া পুষিয়া ও যত্ন করিয়া খাবার দিয়া, ইহাদের অবস্থা এমন করিয়া দিয়াছে যে, এখন তাহারা মানুষের আশ্রয় ভিন্ন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তোমরা বোধ হয় মনে কর, যেদিন গরু ছাগল মহিষ প্রভৃতি প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সেদিন হইতে তাহারা গোয়ালঘরে আসিয়া আমাদের দুধ জোগাইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। অতি-প্রাচীন কালে এই প্রাণীদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাঘ ভালুক হরিণ শিয়াল প্রভৃতির মতো বন-জঙ্গলেই চরিয়া বেড়াইত, এবং সেখানেই তাহাদের বাচ্চাদের পালন করিত। বুদ্ধিমান্ মানুষ পৃথিবীতে জন্মিয়া তাহাদের ধরিয়া গোয়ালঘরে পূরিয়াছে এবং তাহাদের বাঁটের দুধটুকু কাড়িয়া খাইতেছে। কেবল ইহাই নয়, তাহাদের দিয়া ক্ষেত জমি

চাষ করিতেছে, কেহ গাড়ি টানাইতেছে, কেহ বাটের দুগ্ধ বাড়াইতেছে, কেহ বা তাহাদের মাথার লম্বা শিংগুলাকে খাটো করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষের কাছে থাকিয়া এখন তাহাদের অবস্থা এমন হইয়াছে যে, মানুষ ছাড়া তাহারা থাকিতে পারে না। বাঘ-ভালুকে তাড়া করিলে তাহারা এখন দৌড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে না এবং শিং দিয়া গুঁতাইয়া শত্রুকে মারিতে পারে না। কেবল গরু ও মহিষ নয়, মানুষেরা এই রকমে ঘোড়া উট প্রভৃতি অনেক জন্তুর জাত নষ্ট করিয়াছে। এখন তাহাদের অনেকেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের আর বনে-জঙ্গলে খোঁজ করিয়া পাওয়া যায় না; যাহাদের পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা বৎসরে-বৎসরে কমিয়া আসিতেছে। পাতিহাঁসদের সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে। তাহারা হাজার-হাজার বৎসর মানুষের কাছে থাকিয়া সবই হারাইয়াছে; এমন কি, উড়িবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত এখন তাহাদের নাই। পৃথিবীর লোকে মিলিয়া দেশের সমস্ত পাতিহাঁসদের যদি আজ বনবাসে পাঠায়, তাহা হইলে বোধ হয় শিয়াল-কুকুরের হাতে পড়িয়া দুই দিনেই তাহাদের বংশ লোপ হয়। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের সন্তান-সন্ততিরা আজও বনে জঙ্গলে আছে। তাহারা উড়িতে জানে; তাহারা বাসা বাঁধিয়া সন্তান পালন করিতে পারে; শত্রুরা আক্রমণ করিলে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। দেখ, মানুষদের হাতে পড়িয়া পাতিহাঁসদের কি

দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমরা এই জন্যই ইহাদের সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিলাম না। ইহারা মানুষের গড়া প্রাণী,—মানুষ নিজের দরকার বুঝিয়া যেমন করিয়া গড়িয়াছে, ইহারা ক্রমে ঠিক সেই রকমটিই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চকাচকি

চকাচকি হাঁস জাতিরই পাখী। পূর্ব্ববঙ্গের লোক ইহাদের বুগুধি বলে। সংস্কৃতে ইহাদের নাম চক্রবাক্। হাঁসের জাতি হইলেও পাতিহাঁসের সঙ্গে ইহাদের চাল-চলনের একটুও মিল নাই। তোমরা চকাচকি পাখী দেখ নাই কি? ইহারা বারো মাস আমাদের দেশে থাকে না। অগ্রহায়ণ মাসে একটু ঠাণ্ডা পড়িলে ইহারা দল বাঁধিয়া আমাদের দেশে চরিতে আসে; তার পরে একটু গরম পড়িলেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়া ঠাণ্ডা দেশে পালাইয়া যায়। চৈত্র মাসে ইহাদের আর আমাদের দেশে দেখা যায় না। সে-সময়ে তাহারা দল বাঁধিয়া তিব্বত ও মধ্য-এশিয়ার ঠাণ্ডা জায়গায় উড়িয়া যায়। পদ্মার চরে শীতকালে আমরা অনেক চকাচকি দেখিয়াছি। খাল বা বিলে ইহারা চরিতে আসে না। তোমাদের গ্রামের নদীতে চেষ্টা করিলে হয় ত শীত-কালে ইহাদের দেখিতে পাইবে। ইহারা প্রায়ই দুইটায় মিলিয়া এক সঙ্গে চরিয়া বেড়ায়; মানুষের পায়ের একটু শব্দ পাইলেই ফস্ করিয়া উড়িতে আরম্ভ করে।

চকাচকিদের চেহারা নিতান্ত মন্দ নয়। ইহাদের মাথার পালকের রঙ্ সাদাটে; ডানা লেজ ঠোঁট্ এবং পা কালো। ইহা ছাড়া শরীরের অন্য অংশ খয়েরি রঙের পালকে ঢাকা থাকে। তাই দূর হইতে চকাচকিদের খয়েরি রঙের পাখী বলিয়াই মনে হয়। ইহারা নিতান্ত ছোটো পাখী নয়,—লম্বায় ইহাদিগকে দেড় হাত পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি।

হাঁসের মাংস সুখাদ্য। তাই বন্দুক হাতে লইয়া শিকারীরা দলে দলে হাঁস শিকার করিবার জন্য শীতকালে বাহির হয়। প্রতি বৎসরে যে কত হাঁস শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে মারা যায়, তাহা বোধ হয় গুণিয়াই শেষ করা যায় না। কিন্তু চকাচকিদের কাছে শিকারীরা প্রায়ই হার মানে। অনেক দূর হইতে মানুষ আসিতেছে দেখিলেই, ইহারা উড়িয়া পালায়। তাই শিকারীরা বনে-জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া চকাচকি শিকার করে।

ডুবুরি ও নকি-হাঁস

ডুবুরি হাঁসদের বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। আমাদের দেশের ছোটো পুকুর ও খালেও ইহাদের দুই-চারিটাকে প্রায়ই দেখা যায়। আকারে ইহারা দশ-বারো আঙুলের বেশি হয় না। হাঁসমাত্রেরই লেজ ছোটো। আবার ডুবুরিদের লেজগুলি এত ছোটো যে, তাহাদের লেজহীন বলাও চলে। তাই ইহারা ভালো করিয়া উড়িতে পারে না। তাড়া করিলে জলে ডুব দেয় এবং ডুব সাঁতার কাটিয়া অনেক দূরে পালাইয়া যায়। তোমরা এই হাঁসদের দেখ নাই কি? যখন খাল বা বিলের জলে ইহারা সাঁতার কাটে, তখন মনে হয়, কতকগুলি খেলনার হাঁসকে যেন কে জলে ছাড়িয়া দিয়াছে।

ডুবুরি হাঁসদের মাথা কালো পালকে ঢাকা থাকে। কিন্তু বুকের পালক খয়েরি এবং পেট সাদা। তাই দূর হইতে ইহাদিগকে খয়েরি রঙের পাখী বলিয়াই মনে হয়। ইহাদের ডানা অত্যন্ত ছোটো। শুনিয়াছি, সাঁতার দিবার সময় ইহারা পা ও ডানা দিয়া জল কাটে। আমরা ডুবুরিদের কখনই

ডাঙায় উঠিয়া বেড়াইতে দেখি নাই। বোধ করি ডানা ছোটো এবং লেজ নাই বলিয়া ইহারা ডাঙায় উঠিতে ভয় পায়।

অধিকাংশ বুনো হাঁসই শীতকালে আমাদের দেশে চরিতে আসে এবং গ্রীষ্ম পড়িলে ঠাণ্ডার দেশে চলিয়া যায়। কিন্তু ডুবুরিবা তাহা করে না। ইহারা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে এবং এখানেই ডিম পাড়ে ও সন্তান পালন করে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ ইহারা অন্য পাখীদের মতো গাছের ডালে খড়কুটা জমা করিয়া বাসা বাঁধে। কিন্তু ডুবুরিদের বাসা তৈয়ারি কবার রীতি সে-বকম নয়। ইহারা বর্ষাকালে ডিম পাড়ে। ঐ সময়ে খাল ও বিলেব মধ্যে কত ঝোপ-জঙ্গল থাকে, তাহা বোধ করি তোমরা দেখিয়াছ। ডুবুরিরা ঐসব জঙ্গলেব মাথায় শুকনা শেওলা ও খড়কুটা জড় করিয়া সেখানে ডিম পাড়ে। তা ছাড়া জলে যে ডালপালা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাহাব উপরে খড়কুটা পাতিয়া ডুবুরিরা ডিম পাড়িয়াছে, ইহাও অনেক দেখা গিয়াছে ডিম পাড়া হইলে ডিমে তা দিবার জন্য পাখীরা কি-রকম ব্যস্ত থাকে, তাহা তোমবা আগে শুনিয়াছ। কিন্তু ডিমে তা দিবার জন্য ডুবুরিদের সে-বকম ব্যস্ত দেখা যায় না। দিনর বেলায় ইহারা ভিজে শেওলা দিয়া ডিমগুলিকে ঢাকিয়া রাখে। তার পরে রাত্রি হইলে বাসায় গিয়া তায়ে বসে।

নকি-হাঁস বোধ করি তোমবা সকলে দেখ নাই। ইহাদের কেহ কেহ নকতা-হাঁসও বলে। ইহারা বারো মাসই

আমাদের দেশে বাস করে এবং আমাদের দেশেই ডিম পাড়িয়া সন্তান পালন করে। নকি-হাঁসদের চেহারা ভারি অদ্ভুত। ইহাদের মাথার পালকের রঙ্ সাদা। কিন্তু সেই সাদার উপরে অনেক কালো ছিটা-ফোঁটা দেখা যায়। পুরুষ নকি-হাঁসদের ঠোঁটের উপরে আবার চামড়ার চূড়ার মতো একটা অংশ থাকে। বর্ষার শেষে যখন ডিম পাড়ার সময় আসে, তখন সেই চূড়াটি বড় হয়। তাই ঐ সময়ে নকি-হাঁসদের পুরুষগুলিকে দেখিতে অদ্ভুত লাগে।

এই হাঁসেরা জলের ধারে, গাছের কোটরে খড়কুটা পাতিয়া ডিম পাড়ে। এক-একটা বাসায় কখনো কখনো দশ-বারোটা করিয়া ডিম দেখা যায়।

চকাচকি ও ডুবুরিরা চরিবার সময়ে প্রায়ই দুই-তিনটির বেশি একত্র থাকে না। কিন্তু নকি-হাঁসদের আমরা দশ-বারোটাকে এক সঙ্গে থাকিয়া চরিতে দেখিয়াছি।

আমরা যে-সব হাঁসের কথা বলিলাম, সে-গুলি ছাড়া অনেক বুনো হাঁস শীতকালে আমাদের দেশে চরিতে আসে। তুলসিয়া বিগ্‌রি নামে হাঁস তোমরা দেখিয়াছ কি? এগুলি খয়েরি রঙের বেশ বড় পাখী। ইহারা শীতকালে বাংলা দেশে চরিয়া বেড়ায়, এবং গরম পড়িলেই উত্তরের ঠাণ্ডা দেশে চলিয়া যায়। কাজেই, ইহারা কি-রকম বাসা বাঁধে এবং কি-রকমে সন্তান পালন করে, তাহা আমরা জানিতে পারি না। ইহা ছাড়া শাকনল, নাল বিগ্‌রি প্রভৃতি আরো কয়েক জাতি

বুনো হাঁস তোমরা গ্রামের খালে বিলে ও বড় পুষ্করিণীতে খোঁজ করিলে শীতকালে দেখিতে পাইবে। শাঁকনলদের মাথার রঙ গোলাবি এবং গা বাদামি। এই রকম হাঁসদের অনেকেই কেবল কয়েক মাসের জন্য আমাদের দেশের অতিথি হয়, তাই তাহাদের খুঁটিনাটি সব ব্যাপার লক্ষ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

শরাল ও বালি-হাঁস

শরাল হাঁসদের তোমরা দেখিয়াছ কিনা জানি না। ইহারা ঠিক্ হাঁস-জাতির পাখী নয়। কিন্তু চাল-চলন এবং সাঁত্‌রাইবার ভঙ্গী হাঁসদেরই মতো। শরালেরা বেশ বড় পাখী। লম্বায় ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের মাথা ও লেজের রঙ্ যেন কতকটা খয়েরি। ডানা বেশ লম্বা-চৌড়া কিন্তু লেজ ছোটো। বোধ করি লেজ ছোটো বলিয়াই ইহারা ভালো করিয়া উড়িতে পারে না। কিন্তু ডুব দেওয়াতে ও সাঁতারে ইহারা খুব পটু।

শরাল পাখীরা গাছের কোটরে বাসা করে। আবার কখনো কখনো নদীর ধারের উঁচু জায়গায় গর্ত্ত করিয়াও ইহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ইহাদের ডিমের সংখ্যা প্রায়ই আট-দশটা পর্য্যন্ত হয়। কোনো পাখী বাসা ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে, এবং সেই বাসায় অন্য পাখী আসিয়া ডিম পাড়িতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু শরাল পাখীরা কখনো কখনো অন্য পাখীর ভাঙা বাসা মেরামত করিয়া তাহাতে ডিম পাড়িয়াছে, ইহাও দেখা গিয়াছে।

শরাল হাঁসেরা কখনই একা একা চরিয়া বেড়ায় না। ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া ইহাদিগকে এক-একটা বড় জলাশয়ে কিছু দিন চরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। সেখানকার খাবার ফুরাইলে তাহারা অন্য জলাশয়ে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে বলিয়া শিকারীদের বন্দুকের গুলিতে এই পাখীরা যত মারা পড়ে, অন্যরা বোধ করি তত মরে না।

বালি-হাঁসেরা বারো মাসই আমাদের দেশে থাকে। ইহারাও শরাল হাঁসদের মতো জলাশয়ের ধারে গাছের কোটরে বাসা করিয়া ডিম পাড়ে। কিন্তু ইহাদের ডিমের সংখ্যা হয় অনেক। কখনো কখনো এক-একটা বাসায় তেরো-চৌদ্দটা পর্যন্ত ডিম দেখা গিয়াছে। বালি-হাঁসের বাচ্চারা ডিম হইতে বাহির হইয়াও জলে নামিয়া সাঁতার দেয় কিন্তু তখন উড়িতে পারে না। তাই ধাড়ী পাখী বাচ্চাদের ঘাড়ে করিয়া নাকি জলে নামাইয়া দেয়। তার পরে উহারা আনন্দে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশের বড় বড় জলাশয়ে বালি-হাঁসের এই রকম ছানা অনেক সময়ে দেখা যায়।

কড়-হাঁস

কড়-হাঁসদের কেহ কেহ কলহংস বলেন। সংস্কৃতে ইহাদের নাম কাদম্ব। কড়-হাঁসেরা বারো মাস আমাদের দেশে থাকে না। কাজেই ইহারা কি-রকমে বাসা তৈয়ারি করে এবং কতগুলি করিয়া ডিম পাড়ে, এ সব খবর তোমা-দিগকে দিতে পারিব না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই এই হাঁসেরা সাইবেরিয়া তিব্বত প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে থাকে। কেবল শীতকালের কয়েকটা দিন আমাদের দেশে থাকিয়া মাঘ মাসের শেষেই আবার নিজেদের দেশে চলিয়া যায়। ইহারা একটুও গরম সহ্য করিতে পারে না।

কড়-হাঁস তোমরা দেখ নাই কি? শীতকালে গ্রামের খালে বা বিলে ইহাদের অনেককে চরিতে দেখা যায়। যখন ইহারা উড়িয়া এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে যাওয়া-আসা করে, তখন কাক ও শালিকদের মতো এলোমেলো ভাবে ঝাঁক বাঁধে না। তোমরা ড্রিল করিবার সময়ে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া যেমন কাওয়াজ কর, কড়-হাঁসেরা সেই রকম সারি দিয়া ত্রিকোণাকারে উড়িয়া চলে। তোমরা হাঁসদের

এই রকম ত্রিকোণ হইয়া উড়িতে দেখ নাই কি? তোমাদের বাড়ীর কাছে যদি বড় জলাশয় থাকে, তবে লক্ষ্য করিলে সন্ধ্যার সময়ে কড়-হাঁসদের ঐ রকমে উড়িয়া যাইতে দেখিবে। যখন সাইবেরিয়া ও তিব্বত হইতে আমাদের দেশে চরিতে আসে, তখনো ইহারা ঐ রকম ত্রিকোণ হইয়া উড়িয়া চলে। সে-সময়ে রাত্রিদিন তাহাদের চলার বিরাম থাকে না। সাইবেরিয়ার মাঠ হইতে বাহির হইয়া তাহারা কি-রকমে পথ চিনিয়া বাংলা দেশের খাল বিল ও নদীতে আসে, তাহা আজও ঠিক্ জানা যায় নাই। মরুভূমির ভিতর দিয়া বা সমুদ্রের উপর দিয়া দূরদেশে যাইবার সময়ে পাছে পথ ভুল হয়, এইজন্য আমরা কম্পাস্, ম্যাপ এবং আরো কত যন্ত্র ব্যবহার করি। তথাপি পথ ভুল হওয়ায় সময়ে সময়ে আমাদের বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু এই ছোটো পাখীরা কখনো কখনো মাটি হইতে এক মাইল উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াও পথ ভুলে না,—ইহা দেখিয়া সত্যই অবাক্ হইতে হয়।

কড়-হাঁসেরা আকারে কখনো কখনো দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের পিঠ, ঘাড় ও মাথার পালকের রঙ্ কতকটা খয়েরি এবং বুক ও পেটের রঙ্ ধূসর। ঠোঁট ও পায়ের রঙ্ হল্‌দে

ঘরাও পাখী

পাতিহাঁসেরা আমাদের ঘরাও পাখী। ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ ছিল বুনো হাঁস। মানুষ শত শত বৎসর ধরিয়া ঘরে রাখিয়া পুষিয়া তাহাদের কি-রকম দুর্গতি করিয়াছে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। এখন বুনো পূর্ব্ব-পুরুষদের মতো ইহারা উড়িতে পারে না এবং শত্রুর হাত হইতে নিজেদের রক্ষাও করিতে পারে না। কেবল পাতি-হাঁসেরাই যে আমাদের ঘরাও পাখী, তাহা নয়। মুরগী, পায়রা, টর্কি, গিনি-ফাউল, রাজহাঁস—ইহারাও আমাদের ঘরাও পাখী।

মানুষের ঘরে শত শত বৎসর যত্নে পালিত হইয়া এখন মুরগীরা কেবল গণ্ডায় গণ্ডায় ডিম পাড়িতেই পারে। কি-রকমে উড়িতে হয়, কি-রকমে বাসা তৈয়ারি করিতে হয়, এ সব ব্যাপার সকলি তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। মুরগীদের পূর্ব্ব-পুরুষ ছিল, আজ-কালকার বন্য-কুক্কুটেরা। মধ্য-ভারতের বনে-জঙ্গলে এখনো ইহাদের দেখা যায়; সেখানে তাহারা আজও সুন্দর উড়িয়া বেড়ায় এবং বাসা তৈয়ারি করিয়া ডিম পাড়ে।

মুক্ষি, লোটন, লক্কা, গেরোবাজ, পরপাও,—এই রকম কত নামের কত পায়রা আমরা বাজারে বিক্রয় হইতে দেখিতে পাই। এগুলি সবই ঘরাও পাখী। মধ্য-এশিয়া ও চীন দেশের এক-রকম গোলা পায়রাই ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ। মানুষ শত শত বৎসর চেষ্টা করিয়া ঐ বুনো পায়রা হইতে কুড়ি-পঁচিশ উপ-জাতির ঘরাও পায়রা উৎপন্ন করিয়াছে। এখন যদি তোমাদের পোষা গেরোবাজ বা লক্কাকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আইস, তাহা হইলে বোধ করি তাহারা দু'-দিনের জন্যও আত্মরক্ষা করিয়া সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। পূর্ব্ব-পুরুষ গোলা পায়রাদের উড়িবার প্রণালী, বাসা তৈয়ারির কৌশল, সকলি তাহারা মানুষের ঘরে থাকিয়া ভুলিয়া গিয়াছে।

আজকাল অনেকে যে টর্কি পাখী পুষিয়া থাকে, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর লোকে তাহাদের অস্তিত্ব জানিত না। আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের এক বুনো পাখীকে ঘরাও করিয়া মানুষ এই কিম্ভূতকিমাকার টর্কি পাখীদের উৎপন্ন করিয়াছে। ইহাদের বুনো পূর্ব্বপুরুষদের এখন আর দেখাই যায় না। মাংসের লোভে মানুষগুলি মারিয়া তাহাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে।

সমাপ্ত

অধ্যাপক রায়-সাহেব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী

সাধারণ পাঠকদের জন্য অতি সরল ভাষায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিবৃতি :--

১।	প্রকৃতি-পরিচয়	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১॥৴০
২।	প্রাকৃতিকী	ঐ	২৲
৩।	বৈজ্ঞানিকী	ঐ	১॥০
৪।	সার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১॥০

বালক-বালিকা ও মহিলাদিগের পাঠের উপযোগী অমূল্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী। এমন সরল ভাষায় গল্পের মত লিখিত বৈজ্ঞানিক পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই :—

১।	গ্রহ-নক্ষত্র	(চতুর্থ সংস্করণ)	.	১৸০
২।	বিজ্ঞানের গল্প	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	১৲
৩।	গাছ-পালা	ঐ		১॥০
৪।	পোকামাকড়	ঐ		২৲
৫।	মাছ ব্যাঙ্ সাপ	ঐ	...	১॥০
৬।	পাখী	...	...	১৲
৭।	বাংলার পাখী	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	...	১॥০
৮।	শব্দ	...	...	১৲
৯।	চুম্বক	...	..	৸০
১০।	স্থির বিদ্যুৎ		...	১॥০
১১।	চল বিদ্যুৎ	...	...	১॥০
১২।	আলো	...	...	২৲

প্রাপ্তিস্থান :—ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা